KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ২৫২ বি/১ [illegible] ব্লক-২, কলকাতা-৫৫
Collection : KLMLGK	Publisher : দেবযানী মুখোপাধ্যায়
Title : অনার্য সাহিত্য (ANARJYO SHITYA)	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : 1 2 3 4 5	Year of Publication : Summer 1997 Aug 1997 Dec 1997 Dec 1998-99 May 1999 Condition : Brittle / Good ✓
Editor : ?	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

অনার্য সাহিত্য

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯

স্বাধীন লেখকদের প্রমুক্ত উচ্চারণ

নিবন্ধ : অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায় * রাণা চট্টোপাধ্যায়

কবিতা : পবিত্র মুখোপাধ্যায়, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত, শুভব্রত চক্রবর্তী, সলিল চক্রবর্তী, সুভদ্রা ভট্টাচার্য, প্রবাল কুমার বসু, ধীমান চক্রবর্তী, শৌভিক চক্রবর্তী, অমর চক্রবর্তী, তাপস রায়, তাপস চক্রবর্তী, অশোক দে, বৃন্দাবন দাস, কুমারেশ চক্রবর্তী, তমিস্রাজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরূপ বসু চৌধুরী, শর্মী পাণ্ডে, রাজা দাস, রঞ্জন মৈত্র,চঞ্চল মুখোপাধ্যায়, শুভঙ্কর দাশ, শ্রীধর মুখোপাধ্যায়।

গল্প : মনোজ চাকলাদার

বই-আলোচনা : অরণ্য সেন

অনার্য সাহিত্য

ত্রয়োদশ বর্ষ

নবপর্যায় * তিন

শীত ১৯৯৭-৯৮

নবপর্যায় তিন □ শীত ১৯৯৭-৯৮

কথা:

পেশা ও পেশাদারিত্ব শব্দদুটির মধ্যে ভাবগত ফারাক বিসদৃশ রকম। আর পেশাদারিত্ব যখন তার সমস্ত গৃধ্নুতা ও লালসা নিয়ে সাহিত্য-শিল্পে জায়গা করে নেয়, পায় চরম গ্রহণযোগ্যতা তখন শিল্প সাহিত্যের মূল্যমান নিয়েই সংশয় দেখা দেয়। বই লিখে, ছবি এঁকে জীবনযাপনকে ঠিক পেশাদারিত্ব বলা যায় না। পেশাদারিত্ব এক বিশেষ অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থান। প্রফেসানাল লেখকের কাছে গল্প, উপন্যাস, কবিতা প্রোডাক্ট্ মাত্র। প্রফেসানাল শিল্পীর কাছেও তার ছবি প্রোডাক্ট্। সৃষ্টি এবং উৎপন্ন, creation আর product এদের মধ্যে মূলগত তফাৎ বর্তমান।

যখন এ সমাজে পরিষেবাও প্রোডাক্টে পরিণত তখন আশ্চর্য হওয়ার কথাও নয়। কথা এটাই, এসব প্রোডাক্টের শিল্পমান কি? এইসব প্রোডাক্ট্ কোন অন্তর্লীন তাড়না থেকে উদ্‌গত! প্রোডাক্ট যখন, তখন তো তা ক্রেতার মর্জিমাফিকই কেবল। শিল্প-সাহিত্য প্রোডাক্টই যখন, তখন প্রডিউসার বা ম্যানুফ্যাক্চার-রা তো চাইবেই চরম উৎপাদন এবং সর্ব্বোচ্য মুনাফা।

লণ্ডন, পারী, প্রাগ্, টরন্টো, লিস্‌বন, দিল্লী, কলকাতা সর্বত্রই আজ এই প্রফেসানাল শিল্প-সাহিত্যের সর্ব্বব্যাপী প্রহসন।

শিল্প-সাহিত্যের অবক্ষয়ের কালে কেবল শিল্পী সাহিত্যিক-কে এই অধঃপাতের জন্য দায়ী করাও অবান্তর। মূল্যবোধ-বিলুপ্ত চূড়ান্ত পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থাই এহেন অবস্থাকে প্রাণিত করে

আজ তো দক্ষিণপন্থী-বামপন্থী, প্রতিষ্ঠানবিরোধী-প্রতিষ্ঠানমুখি সব কারিগরদেরই নোবেল, বুকার, ম্যাগ্‌সেসে, জ্ঞানপীঠ, অকাদেমি পুরস্কার নির্দ্বিধায় গ্রহণের কাল। পুঁজিবাদ কি চমৎকার দক্ষতায় শিল্পসাহিত্যের বিবিধদের একাসনে মিলাইয়াছে!

শিল্পসাহিত্যের বর্ণময় অন্তর্জলিতে তুমিও সামিল হইবে কি?

অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

ততোদিনই তলোয়ার

সিংহাসনে যতদিন ততোদিনই তলোয়ার। ভোঁতা হলেও ভারে কাটবে। তো একালের মিডিয়ার আশ্রিত লেখক কবিদের ক্ষেত্রেও একই প্রবাদ প্রযোজ্য। যতদিন মিডিয়ার দেওয়া চেয়ার ততোদিনই নামকাম। চেয়ারটি সরলেই—হয় বিমল কর নয়তো আনন্দ বাগচী। যারা মিডিয়ার একাদশে রয়ে গেল—তাদের অবস্থা আরও করুণ। মালিকের হুকুম—এ্যাই গল্প লেখ—তো একদিনের তুর্কি কবি কোমর বেঁধে গল্প ফাঁদতে বসল। এ্যাই রহস্য ধারাবাহিক লেখ—তো সাহিত্যিক মশাই তার ইষ্টগুরু স্মরণ করে বসে গেল রহস্য ধারাবাহিক লিখতে। বেঁচে থাক আগাথা ক্রীষ্টি/স্ট্যানলি গার্ডেনারা-রা। তা ছাড়া যা লিখবে তাই ছাপার গ্যারান্টি এবং সঙ্গে সঙ্গে থোক এককাঁড়ি টাকা! ওঃ ভাবা যায়—এমন হোলে তো বেঁচে থাকা পিতার শ্রাদ্ধও করা যেতে পারে নির্দ্বিধায়। মিডিয়ার খোঁয়াড়ে যাদের জিইয়ে রাখা হোল—মাঝে মধ্যে তাদের পুরস্কার টুরস্কার দেওয়া/বিদেশে পাঠানো এসব তো রইলই। ভজ গোবিন্দ কোরে যাও গুরু/কলিকালের দাঁও মেরে নাও। নাও, কিন্তু মুস্কিল হোল কালের প্রহরী বড়ই নিষ্করুণ। এক এক কোপে সব নির্মূল কোরে ছড়িয়ে দেবে অনন্তে। কোথায় গ্যাল পঞ্চদশ সংস্করণ মার্কা লেখক বিমল মিত্র/দু দু বার আনন্দ পাওয়া বিমল কর/সরকারী তোপদাগা কবি শক্তি চাটুজ্যের মদ খাওয়া আর নানান গিমিকের গপ্প—যা তার কবিতার চেয়ে বেশি ভারী ছিল সে! জীবনানন্দ, নিদেন বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের মত কালের দণ্ড এড়িয়ে থাকতে হোলে জয় গোস্বামী-কে এখনি দাড়ি কামিয়ে গঙ্গাস্নান কোরে কবিতার জন্যে.....হ্যাঁ শুধু কবিতার জন্যেই কলম ধরতে হবে। সুনীল গাঙ্গুলী হবার এলেম সবার নেই। কারও নেই। তাই ও চেষ্টা না করাই ভাল। বরং বামেও আছি, দক্ষিণেও আছি কোরে ব্যাঙ ও সাপ দুটোকেই তুষ্ট রেখে শঙ্খ ঘোষ হওয়া সম্ভব। বেহতর তো বটেই—বিশেষ এই কলিকালে। কালের প্রহরী এটা এ্যালাও করতেও পারে, যেমন করেছে—বাম শিরোপাধারী লিটলম্যাগের ছদ্মবেশী অনুষ্টুপকে! সম্পাদক আচার্যি মশাই বেড়ে কারবার ফেঁদেছে—এসট্যাব্লিসমেন্ট বিরোধিতাও হোল আবার লাখ টাকার বিজ্ঞাপন হাতানোও হোল। তাছাড়া দশ বিশটা গ্রাহক/আজীবন সদস্য হওয়ার বদলে কবিতা বা গল্প ছাপানোর টোপ তো আছেই.....দুষ্টু লোকে আবার 'আগুনে পোড়া বইমেলা এবং আচার্যি' শীর্ষক রম্য আলোচনা কোরে সুখ পায়। আচার্যি মশাই একটি খোঁয়াড়ও বানিয়ে ফেলেছেন—বলা যায়। সেখানে বড় খোঁয়াড়ে জায়গা না পাওয়াদের ভীড় বাড়ছেই। বাড়ুক। কিন্তু ওই কালের প্রহরী-! কোন বুদ্ধ অথবা যীশু তার খড়্গাঘাত থেকে বাঁচাতে পারবে না—এদের।

সিংহাসন অপসৃত হোল বোলে এবং তখন তলোয়ারের ধারও শিলকুল ভোঁতা—কালের প্রহরীর এই নির্দেশ!

মনোজ চাকলাদার

ষড়যন্ত্র : ভালবাসার দে রে অবসর

১.

হ্যালো
বলুন
663-2946
হ্যাঁ বলুন
আপনি কে কথা বলছেন
কমলা চক্রবর্তী
সুতপা নেই
এখন নেই, কিছু বলতে হবে
না থাক—

ফোন রেখে দেয় জয়ব্রত। সাত দিন ধরে ফোন করে পাচ্ছে না সুতপাকে। যতবার ফোন করেছে হয় ওর মা না হয় বাবা অথবা ভাই ধরেছে। একই উত্তর, এখন বাড়িতে নেই। কোথায় যায় সুতপা।

হ্যালো
বলুন
449-3636
হ্যাঁ বলুন
আপনি কে কথা বলছেন
শুভব্রত রায়
জয়ব্রত নেই
এখন নেই, কিছু বলতে হবে
না থাক—

ফোন রেখে দেয় সুতপা। গত সাত দিন ধরে ফোন করে পাচ্ছে না জয়ব্রতকে। যতবার ফোন করেছে হয় ওর বাবা না হয় ওর মা অথবা বোন ধরেছে। একই উত্তর, এখন বাড়িতে নেই। কোথায় যায় জয়ব্রত।

জয়ব্রত ঠিক করে আজ অফিস যাবে না। সুতপার বাড়ি যাবে। কিন্তু ফোন করে গেলে হত। কিন্তু ফোন এনগেজড। অপেক্ষা করে। আবার ফোন করে। রিং হয়ে যাচ্ছে, কেউই ফোন ধরে না। ফোনের ওপর রেগে দড়াম করে রিসিভারটা রেখে দেয়। মা জিজ্ঞেস করে, কি হল জয়—

২.

ঠিক করে আজ বেরুবে না সুতপা। একবার জয়ব্রতর অফিসে যাবে। ফোন করে অফিসে। এনগেজড। দুর। বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল সুতপা জয়ব্রতর অফিসের দিকে। অফিসে এসে শোনে জয়ব্রত আজ অফিসে আসেনি। চিঠি লিখে কাউকে দেবে কিনা, যদি সে না দেয়। ভুলে যায়। যাক ওসব করতে হবে না। জয়ব্রত নিশ্চয় আজ বাড়িতে আছে। টেলিফোন বুথ থেকে জয়ব্রতর বাড়িতে ফোন করে। এনগেজড। বুথের বাইরে লাইনে তিনজন রয়েছে। আবার ডায়াল করে। এবারও একই ইঙ্গিত। কতক্ষণ কথা বলে রে বাবা! বেরিয়ে এল বুথ থেকে। বাড়ি যাবে জয়ব্রতর। একই শহরে থাকে দুজন। দশদিন হল ওদের দুজনের মধ্যে কোন যোগাযোগ নেই।

জয়ব্রতর বাড়ি এল সুতপা। বাড়ি নেই। কোথায় গিয়েছে বলে যায় নি। কখন আসবে বলে যায়নি। ভাবে তার কি একবারও সুতপার কথা মনে পড়ে না। ভেবেছে কি জয়ব্রত। ভেতরে ভেতরে কান্না উঠে আসে। কি অদ্ভুত কান্না উঠে আসলেও কান্না কাউকে দেখানো যায় না। কিচ্ছু লিখে রেখে যাবে না। দেখা যাক কতদিনে ওর দায়িত্ব জ্ঞান হয়।

জয়ব্রত ফোন করে করে যখন কোন সময় লাইন পাচ্ছে না, ঠিক করে সে সোজা সুতপার অফিসে যাবে। ফোন টোন না করেই যাবে। অফিসে এসে জানতে পারে সুতপা আজ অফিসে আসেনি। এরপর ওর বাড়িতে আসে। কিন্তু ওর মার কাছে জানতে পারে সুতপা অনেক্ষণ আগে বেরিয়েছে। কোথায় গেছে বলে যায়নি, কখন আসবে বলে যায়নি। রাগ হল জয়ব্রতর। সুতপা কি এখন আর জয়ব্রতকে ভালবাসে না।

৩.

দশদিন ধরে সুতপার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছে না। ফোনে অফিসে পাচ্ছে না বাড়িতেও পাচ্ছে না। অফিসে হয় ফোন এনগেজড, না হয় সুতপা সিটে নেই, নয় আসেনি। একদিন তো বারো বার করেও পায়নি। একদিন অফিসে সারাক্ষণ থাকবে, গিয়ে দেখে সেদিন আসেনি। বাড়ি গিয়ে জানতে পায় কোথাও বেরিয়ে গেছে। নিজের বাড়িতে গিয়ে শুনতে পায় সুতপা নাকি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে করে কিছুক্ষণ আগে বেরিয়ে গেছে। রাগ ধরে সুতপার ওপর। ছিলে ছিলে আরো আধ ঘন্টা অপেক্ষা করতে পারতে। ফোন করে বাড়িতে। বাড়িতে নেই সুতপা। ওফ!

বাড়িতে এসে সুতপা শোনে কিছুক্ষন আগে জয়ব্রত এসেছিল। রাগ হল তার ওপর। থাকতে থাকতে আরো আধ ঘন্টা থাকতে পারতে তাহলেই দেখা হয়ে যেত। ব্যাপারটা বেশ অবাক লাগে। গত দশ দিন ধরে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারল না।

সুতপা আর একটা চেষ্টা করতে পারে তাহল চিঠি লেখা। খামে লিখলে বা ইনল্যাণ্ড লেটারে লিখলে কবে পৌঁছবে তার ঠিক নেই। বরং পোষ্ট কার্ডে পাঠাবে। কিন্তু তাও

তো সাতদিন লেগে যাবে উত্তর পেতে পেতে। একই শহরে থাকে তারা অথচ ওর সঙ্গে দেখা করতে পারছে না। নাকি জয়ব্রত এরকম লুকোচুরি খেলছে। ক্যুরিয়রে চিঠি পাঠাল সুতপা। কোন উত্তর নেই। চারদিন হয়ে গেল। যেখান থেকে ক্যুরিয়র করেছিল গিয়ে বলে কি হল দাদা, আমি চিঠি পাঠালাম, এখনও রিসিভ একনলেজমেণ্ট পেলাম না। খাতাপত্তর খুলে বলে, না ম্যাডাম আপনার চিঠি তো পৌঁছে গেছে।

না—

বাড়ির কেউ হয়তো পেয়েছে

না

হয়তো হারিয়ে ফেলেছে। আমাদের জেন্যুইনিটি আছে—তর্ক করতে ভাল লাগে না সুতপার। ক্যুরিয়র সার্ভিসগুলোও হয়ে গেছে পোষ্ট অফিসের মত। আগে ভাল ছিল এখন পোষ্ট অফিসের মত সার্ভিস হয়েছে।

জয়ব্রত বার কয়েক ক্যুরিয়রে চিঠি পাঠিয়েও কোন উত্তর পায়নি। যতসব বোগাস কোম্পানী। সুতপাদের টেলিফোন করলে শুধু রিং হয়ে যায়। তারপর কাট। দুদিন বাদে বাদে টেলিফোন খারাপ। আর বিলের সময় আটশ নশ টাকা। বললেই বলবে, আগে টাকা জমা দিন, তারপর দরখাস্ত করুন। তখন দেখা যাবে।

৪.

সুতপা আজ অফিসে গেল না। কুড়িদিন হয়ে গেল জয়ব্রতর সঙ্গে দেখা করতে পারছে না। মনটা বড় খালি খালি। এতদিন সে কাউকে ভালবাসে বলতে পারছে না। সুতপা কোনদিন এতদিন ভাল না বেসে থাকেনি।

ছাদে উঠে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। নীল আকাশ। কী সুন্দর শান্ত আকাশ। বলে, ভালবাসি—

নীল আকাশ ধীরে ধীরে রং বদল করে। হয়ে যায় গেরুয়া। বিস্মিত হয়ে দেখতে থাকে সুতপা। মনের ভেতর গুনগুনিয়ে ওঠে, জলে স্থলে ভালবাসি, ভালবাসি—

গেরুয়া আকাশ গোলাপী হয়ে যায়। আবার ধীরে ধীরে হালকা সবুজ হয়ে যায়। আকাশের এত রং বদল হতে দেখেনি। দেখে আকাশ থেকে ছুটে আসছে কোমল একটি তারা। তারা তার কাছে আসতেই ঘরে ছুটে পালায়। মন খারাপ হয়ে গেল সুতপার। কালো হয়ে গেল আকাশ।

জয়ব্রত অফিসে গেল না। নদীর পাড় ধরে ধরে হাঁটতে থাকে। এতদিন ধরে সে না ভালবেসে থাকেনি। বুক জুড়ে উথলে উঠছে ভালবাসা। ভালবাসা।

পথের পাশে একটি অন্ধ মহিলা ভিক্ষে করছে। বলে, ভালবাসি— মহিলা বলে, কে গো বাবু দুটো পয়সা দিয়ে যাও— থমকে দাঁড়ায় জয়ব্রত। গেয়ে ওঠে, ভালবাসি ভালবাসি জলে স্থলে ভালবাসি—

অন্ধ মহিলার চোখ ফুটে গেল। দেখে বলে, আঃ মরণ ছেলের বয়সী ছোকরা বলে কিনা— লজ্জা লজ্জা, ভাবলাম কিনা—

জয়ব্রত ওদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ করে না। নদীর দিকে তাকিয়ে বলে, ভালবাসি—।

নৌকাতে বসে আছে এক জেলে মহিলা। তাকায় জয়ব্রতর দিকে। মহিলা বলে, আঃ মরণ, মুখে আগুন জ্বেলে দেব—

জয়ব্রত দেখে নদীর রং বদলে যাচ্ছে। নৌকাগুলি সোনালী হয়ে গেল। জলের ধারা বদলে নীল হয়ে গেল। বলে, ভালবাসি—। নদীর রং বদলে সোনালী হয়ে গেল। তরল সোনা বয়ে যাচ্ছে। নেমে জলে হাত দেয়। মুখে দেয়। সুশীতল জল। বলে, ভালবাসি— জলের ভেতর থেকে উঠে আসছে আগুন। আগুনে লাফিয়ে উঠছে মাছ। ভাজা হয়ে যাচ্ছে তারা। নৌকা পুড়ে যাচ্ছে। লাফিয়ে উঠে এল পাড়ে। নদীর রং বদলে গেল। ঘোলা জল।

৫.

এভাবে জয়ব্রত কতদিন থাকবে। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেয় পাত্রী চাই। একশ ছেষট্টিটা চিঠি এল। একটা বেছে বিয়ে করল জয়ব্রত। প্রেম করতে থাকে সে। তার ছেলে হল মেয়ে হল। ঘর বাড়ি করে।

বিয়ে করে সুতপাও। ছেলে মেয়ে হয়। প্রেম করতে থাকে সে। ঘর বাড়ি করে।

৬.

জয়ব্রত ময়দানে ফুচকা খেতে নামে। দেখে সুতপাও ফুচকা খায়। জয়ব্রত তাকায় সুতপার দিকে, সুতপাও তাকায় জয়ব্রতর দিকে। জয়ব্রত বলে, তোমায় কতদিন ফোন করেছি চিঠি দিয়েছি উত্তর দাওনি— সুতপাও বলে, আমিও ফোন করেছি চিঠি দিয়েছি। উত্তর দাওনি।

জয়ব্রত বলে, মিথ্যে কথা।

সুতপা বলে, সত্যি কথা, তুমি মিথ্যে কথা বলছ

জয়ব্রত বলে, আমাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করল কে বলো তো—

সুতপা একটা ফুচকা মুখে দিয়ে বলে, আওফ, খেতে খেতে ওপরে হাত তুলে কিছু একটা বলতে চায়। কিছুই বোঝা গেল না।

জয়ব্রত হাসতে হাসতে বলে, ফুচকা—

ঘাড় নেড়ে সুতপা বলে, হুঁ হুঁ—

দুজনেই সেই অবস্থায় স্টাচু হয়ে যায়। চারপাশের লোকেরা অবাক হয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

স্টাচু দুটো ফিক ফিক করে হাসতে থাকে।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

হাড়ের পাহাড়ে উড়ছে

হাড়ের পাহাড়ে উড়ছে গৈরিক পতাকা, চেয়ে দেখো;
ত্যাগ ও বৈরাগ্য, দুটি শব্দের আশ্চর্য যাদু
আমাদের দিব্য অবদান;
কোথাও রাতের ওই আপাত শান্তির বুক চিরে
রাতপাখিদের গান
বাতাসে তরঙ্গ তুলে চলে যায়।
একটু পরে হাড়ের পাহাড়ে সূর্যোদয়
হবে, হবে পতাকা স্বর্ণালী, সূর্যোদয়ের রঙ্গেই
তার রঙ।
এ মুহূর্তে ভাবা যাক অন্য কোন দৃশ্যই বরং।

এই সব পাহাড়ের দিন দিন বেড়ে ওঠা
কতোশত হাড়ের সঞ্চয়ে;
মৃত মানুষের নয়, জীবিত মানুষ'ও দান ক'রে গেছে
নিতান্তই নিরুপায় হয়ে!
বাঁচা ও মরার মধ্যে ব্যবধান কমে যাচ্ছে-
দেখে ভয়ানক
ফ্যাকাশে হচ্ছিল; হয়তো কোথাও নিশ্চিত কোনো
শান্তির বিষয়ে নিরুৎসুক
হয়েছিলো, কোথাও বা দেশনেতা
কম্বল দানের ইচ্ছেসুখ
পেতে চায় বলে ঢেড়া পিটিয়ে কঙ্কাল জড়ো
করেছেন মাঠে

অহিংসা মন্ত্রের তুবড়ি ফাটাচ্ছেন মঞ্চে যে আকাটে
তিনিই পতাকা তুলে পুষ্পবৃষ্টি করেছেন—
এরকমই হয়।

কেউ কি খুক্ ক'রে কাশলো? কারো কিছু রয়েছে সংশয়—
মানবতা পৃথিবীতে জীবিত না মৃত?
এসব প্রশ্নের চেয়ে নিরুদ্‌বেগ কাম পেতে আত্মসমাহিত

হওয়া ভালো।
তখনো কি নারকেল পাতার ফাঁকে পঞ্চমীর চাঁদ
উঠে অন্ধকার কিছু আলোড়িত করে যায়? এটুকু সংবাদ
দিতে চেয়ে কবি সেই ভাঁড়ের উদ্দেশে ছুঁড়ে
দিয়েছিলো যে মাটির ছুরি,
দেখে সমাগত যত কঙ্কালেরা উঠেছিলো একসঙ্গে হেসে।

হে হে করে হেসে উঠলো অদ্ভুত পাগল
সেই সুন্দর সুভদ্র সমাবেশে।

সুভদ্রা ভট্টাচার্য

ঘুম

জাল পেতে রোদ্দুর তুলছি বাড়ীর উঠোনে
রোদ্দুর ঘেঁটে দেখছি স্বপ্ন লুকানো আছে কিনা ওখানে
ব্যস্ত শববাহকেরা হাঁটছে অ্যাসফল্টের রাস্তা দিয়ে
ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে যেন স্তব্ধ বিবেক আনছে বয়ে
সুখের ভারী ওজনদর অথবা জন্মান্তরের স্বপ্ন
পৃথিবীর সব আলপথ দিয়ে চুঁয়ে পড়ছে ইচ্ছের নুন
জোড়াতালি দেওয়া ভালোবাসার গল্পগুলি হারিয়ে যাচ্ছে
নতুন সার্থক গল্পের খোঁজে
আর বজরা বোঝাই আমাদের সুখদুঃখ
পাচার হচ্ছে এ বন্দর থেকে অন্য বন্দরে যেন রুক্ষ
ইচ্ছেগুলি হাজির হচ্ছে শব্দকে বাজাবে বলে
তখন ধরা পড়ছে যন্ত্রণার অশক্ত জালে
মানুষের গল্প কথা বড় অসহায়ভাবে
যেন বপন করা স্বর্গসুখ দিয়ে যাবে
ধার করা আমাদের এই আঁশটে জীবনে
যার জন্য রেখে যাব স্বপ্নের চারাগাছ
আজ দেখি সেই মোমের জীবন গলছে
গলছে স্বপ্ন, গলছে দুঃখ, গলছে আবেগ
আর আমি জাল পেতে রোদ্দুর তুলতে তুলতে
ক্লান্ত কামনায় জড়াচ্ছি রোদ্দুরের ঘুম স্বপ্নে জাগরণে।

সলিল চক্রবর্তী

তুমি সৃষ্টি দাও

পঞ্চম দিবসে তোমাকে দেখি
সোনার মতো—
উলুখড় সরে গিয়ে, বাদামি আলো সরে গিয়ে
তুমি প্রকৃতই বহমান নদী।

আমাকে কখন থেকে ডাকছো
শরীরের জবা নিয়ে—কখন থেকে ডাকছো
ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি,
গাছভরা ঘুম, স্বেদ
আলোর রঙিনতা নিয়ে
কখন থেকে ডাকছো।

বৃষ্টি হয়ে, ঝরে, জড়িয়ে পড়ে
তুমি সৃষ্টি দাও শুধু—নির্মাণে নির্মাণে!

পটক্ষেপ

ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনি আমি...
ওই যেখানে শব্দ নিয়ে আছে
পেঁপে, নিম, হরিতকী, কাঁচাকলা, হলুদ, তুলসি,
আশেপাশে কাজিপান, গোঁড়ালেবু
পাথরকুচি ও তেলাকুচু!

মন্দিরটা ভেঙে গেছে
তবু ওই আকাশের নিচে
একদঙ্গল মানুষ, আড়াল করছে রোদ,
মানুষের।

সামনে বটবৃক্ষ, ওলাবিবি।
ওঁরা পুজো দেবেন, মানতও করবেন হয়তো বা।

যে-জলে পড়েনি একটাও মৃত পশু,
আবর্জনা স্তূপ, কীটনাশক ওষুধের থাবা বা
রোগির কফ, মূত্র, জামা—স্নান ক'রে
সুস্থ হবো আমি
নিশ্চিন্ত মাছের মতো। আর পান করবো
শিউলির মতো স্বচ্ছ জল
শরীর খারাপে অবশ্যই থাকবে
ও. আর. এস., ইলেকট্রাল, হ্যালোজেন নয়তো
নুন-চিনি রিহাইড্রেশান,
ডাক্তার, ডাক্তার।

বাচ্চারা এবার খেলুক।

পার

তাপস রায়

পাথর খুঁড়তে খুঁড়তে জল। জলের উত্তরাধিকার
স্নেহ হয়ে বয়ে যাচ্ছে যখন এবং ফলাফল হীন
ফ্রক জেনে ফেলেছে ছায়াপথ, অধরা রহস্য
এই পাগল মরসুমে নগরপালের অনুমতি ছাড়াই
আসুন, আমাদের খনন থেকে প্রত্নরত্নের মত লজ্জা বেরিয়ে আসুক
পার্কের চওড়া সিঁথিতে জন্ম নিক প্রেম

গুনগুন করে গান করছিলো যেসব দিন মাস বছর
তাদের সাথে অর্কেস্ট্রা জুড়ে দিয়ে পুরুষ হতে চাইছে জেব্রাক্রশিং
আর আমাদেরও হাত সন্ধ্যার সুতোটি ছিঁড়ে ফেলতে উস্‌খুস্।

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

খনা

আমি লঞ্চ করব স্পেস ক্রাফট। কবিতার বই।
আলোর গতিতে ছুটবে। শক্তিপুঞ্জ ট্রেন।
গ্রহান্তরে জীবজগতের বুকে কম্পিউটার পর্দায়
অনুভূতি ডিকোডেড হবে। আজ এই নশ্বরতা
তোমাদের ধুলো বালি মেখে পাল্ল হবে। হোক।

মৃদুগান বেজে ওঠে। স্বপনপারের ডাকে সাড়া
দিচ্ছে মেঘলা মেয়েটি। তার এই মরমী বোকামি
তোমাদের মুখোশের মুখে হাসির টুকরো হয়ে
লেগে থাক। শূন্যে সহযাত্রিনীর টিকিট পেয়েছে।

নিছক কৌতুক বলে মনে হচ্ছে। হতে পারে। হোক।
পুরোনো পৃথিবী নিয়ে একমিনিট নীরবতা। শোক।

চঞ্চল মুখোপাধ্যায়

আটপৌরে স্তোত্রপাঠ

অনেক অনেক অবসর তারপর
কবিতার উত্তেজনা
হাঁটু গেড়ে বসা প্রার্থনা—
যদিও বুঝিনা যন্ত্রণা
কষ্টই সার
কবিতার পারাপার তরল মনের অভ্যেস
নির্বাক চলাফেরা এবং
অদর্শনের মধ্যে হারিয়ে ফেলছি নিজেকে
চারপাশ জুড়ে এক ভয়াবহ শূন্যতা
অনেক উঁচু ছাদ থেকে পড়ে যাবার মতো
সব ফাঁকা আর আমি দ্রুত নেমে যাচ্ছি-

দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে
ক'য়েক ফোঁটা ক্লান্তি।

অমর চক্রবর্তী

বৈদিক আলো

মন খারাপের নরম মাটিতে কংক্রিট ঢালাই
দিলুম আজ। এত নড় বড়ে ভিতে বাস করা যায় না।
যখন তখন ঝড় ওঠে অপশাসনের পুলিশ
বেয়নেট ইলেকট্রনিকস মিডিয়ার। ঝড় ওঠে
ব্যর্থতার, ধাক্কা মারে কড়া শাসন। অভাব পুকুর
বুঁজিয়ে আমার ঘরবাড়ি, দাস হবার শিক্ষা দীক্ষা
ছোট্ট ঘুলঘুলি বন্ধ বাতাস। একটু একটু করে
বসে যাচ্ছিল, ধ্বসে যাচ্ছিল, ধ্বংস হচ্ছিলাম
অসভ্য লোভী বাতাস আর ভেজা ভেজা আকাশ
যৌনতায় অসুখ বিসুখ লেগেই ছিল। এভাবে
কতদিন বাস করা যায়। স্বাস্থ্য ফেরাতে, অতীব
কষ্টে তুলেই দিলুম ক'টা পিলার, পিলার
প্রতিপক্ষের, বিরুদ্ধ দিনের ...। কংক্রিট
বৈদিক আলোর।

অরূপ বসু চৌধুরী

শূন্যতা বিষয়ক

শূন্যতা ও সময় সমার্থক কিনা
বুঝে ওঠার জন্য কিছুটা সময় চাই
তারপর আবার আমি মেতে উঠতে পারি আকাশের রঙে
ক্লোরোফিল যেভাবে শুষে নেয় আলোর ফোটন কণা
তার মতো সময়কে শুষে নিতে চাই।
শূন্যতার গায়ে টোকা মেরে দেখি
কোনো শব্দ বেজে ওঠে কিনা
আতস কাঁচের নিচে ফেলে দেখি তাকে
কোনো রঙ ধরা দেয় কিনা।
দেখেছি শূন্যতা ছাপিয়ে আমি যতদূরই উঠি
একটা সময় আসে
যখন সে একটা মস্ত চুম্বক পৃথিবী
আমি যার হাঁ এর মধ্যে টুপ করে খসে পড়ি।

শুভব্রত চক্রবর্তী

গম্বুজনগরের পাখি—১৭

কলঙ্কের দাঁত থেকে ঝ'রে রাত্রিলাগা দেহশিল্প
আজ সেই গর্ভকোষে যেন ভিন্নতর মাতৃধ্বনি,
খোলা বারান্দায় নামে চাঁদ, চাঁদনীর আত্মজীবনী
পাখি নয়, স্নায়ুর ভিতরে দোলে তোমারই বিকল্প ;
মহাকাশ ছুঁয়ে যায় স্বপ্নলোক আকাঙ্খার ডানা
অথচ অনেক নিচে লজ্জানত তোমাকে বুঝিনি!
'স্মৃতি নেই' বলে নিজে হাতে বন্ধ করেছে যামিনী
ঘৃণায় বিশ্রামকক্ষ, ধীরে ধীরে সব উন্মাদনা।

বাজে পালক শৈশব, মায়ের আঙুলে বৃষ্টি নেমে
হারানো পিয়ানোর উপর, আজ এই শীতপ্রেমে।
যদিও স্থাপত্য ভেঙে ধুলো ওড়ে স্নানের উচ্ছ্বাসে
উড়ে আসে বিধবার স্বামী, আরও কামাতুর হয়ে
এই অন্ধকারে তখন পরীরা হাসে, খুব হাসে
কলঙ্কের দাঁত থেকে তুমি ফেরো পতন বলয়ে।

বৃন্দাবন দাস

এইসব কাঠকথা

এইসব কাঠকথা আর ভালো লাগে না

তঞ্চক প্রমোদ ভ্রমণ,
আর কিছু হাল্কা জড়োয়া,
চৈতালি ধূলো-পা
শ্বাসকষ্ট শিরোনাম,
কিম্বা আঁকবার মতো কিছু
দিগম্বরী অনুশীলন—
কেমন যেন তামাসিক
ত্রিভুজ ভাবনা মনে হয় ;

অপহরণ যতটা সহজ
বাতিঘর তত ঠিক
শিহরণ জানে না,
সোনার সংসার মানে
সদা আনন্দে থাকো, অথচ,
ধীমান যে ক'জন ছিলো
বিদায় নিয়েছে ঢের আগেই;

হাড়-হা-ভাতে এ-আলিঙ্গন
গোপনতা শেখেনি,
চিনতে পারেনি—
সেতুর ওপর কার চোখ
কোন্ দিকে
সত্যি তাক ক'রে আছে।

অশোক দে

ফিনিসিয়া বিরিঞ্চবেড়িয়া

নখের আঁকশিতে গড়িয়ে পড়া পাথর
ছিটকে ছিটকে জোনাককীট

শম্ভুদা : শম্ভু রক্ষিতের অমল শিশুটি পাঁজর
আঁকড়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠলো মলচ কাকু

আলো আঁধারির শরীরী খোয়ারে দুশটি রজতমুদ্রা
খুইয়েছে পাতাল বিবরে মলয় দাশ
গুপ্ত কথা

শিশুটি মলয় শব্দে অমসৃণ হয়তো

বিরিঞ্চিবেড়ের প্রান্ত জুড়ে অসংখ্য স্পন্দমান তর্জনী অযুত শিশু শষ্প চুঁয়ে
ভূতুক হয়ে উঠছে শোণিতময়

সরে যাওয়া কাঠপিপিলিকা
পতঙ্গ উদ্যত পতঙ্গভুক পরিখা

আলস্যের বেড়
শুয়ে থাকা বাঁদিকের সারিতে ধেয়ে আসা বিহঙ্গকুসুম
ছায়াংশে সঞ্চালিত স্বলেখন
দালি
সালভাদোর
সালভাদোর দালি
সালভাদোর কোয়াসিমোদো
সালভাদোর লোরেনজিনি
শেষের নামে কোনো মানুষ নেই
ঘাস নেই
বেলাভূমি নেই
জলপাই জঙ্গল ছাড়িয়ে তটের কাছে
ভাসছে ফিনিসীয় পোত
ৎজেবেক

রামকিশোর ভট্টাচার্য

কোষ

এই ভাঙা গীটারটিই কাল সারারাত
পদ্মনাভ ছিল।
আর এক মোমশিখা হাতছানি হয়ে
দূর নক্ষত্রদের শিখিয়েছিল কম্পনাঙ্ক
পশ্চিমের দরজায় তখন চৈত্র দেখার ফাঁকে
একটি পায়রার উদাস বকম
আজ সকালেও ঝোলা ব্যাগ থেকে
তুলে আনছে
মটরদানা....
সেগুলি মেঝেয় পড়েই গর্ভনিরোধক

এবার বুঝেছি কেন নাভিকুণ্ডলে অ্যাতো জট,

অন্য দিকে অদ্ভুত বৃন্ত থেকে গড়িয়ে আসা
শ্বেত অমৃতে
ভেসে গেল গুঁড়ো মাটি...মহাসমুদ্র... ভৌতপথ,
চিত্রনাট্য লেখা হ'ল ফুটপাত জুড়ে, আর
এক কোষ গর্ভ হয়ে উঠতেই—
রাত দিন মেঘ ডাক
তারই ভাঙা অংশ কোথায় বিস্ফারিত
কোথাও বা তপোমগ্ন
রাস্তা ফুঁড়ে নিজেকেই
গুল্ম-শষ্প ভাবে.....

তাপস চক্রবর্তী

দার্শনিক চোখে যখন তাকে দেখা গেছে

হঠাৎই প্রস্তাবনা শুরু হল

এবং ক্রমে-ক্রমে শূন্য নভের
মহর্ষিরাত, সম্মুখে এসে দাঁড়াল

আমি তাঁর অস্তগৃহে যাবো বলে
যখনই পথ ধরে হাঁটতে যাবো

আত্ম গলিত শবের দৃশ্য সে সময় ভাসমান হল

এভাবে বিজন স্মৃতিরা আসে—স্বপ্নের ওপার থেকে
দার্শনিক চোখে মহাশূন্যের প্রবীন নক্ষত্ররা তা দেখে

শেষ পূর্ণিমায় যখন আমি

পূর্বাভাসে প্রতিশোধ ছিল
অথচ অপরাহ্নে এসেছো মেঘ, স্নিগ্ধমন্ত্রে
আত্মহননের জ্যোৎস্নালোক নিয়ে—

আমি প্রেতবর্ষের ভাষা বুঝি
অনন্ত মুহূর্তে আত্মমুণ্ডমালা ধারণ করি

ঠিক তখনি তুমি অবগাহনে গেলে
গোধূলি আকাশের শেষ সীমান্তে

সে সময়, ঋষির উজ্জ্বলতা নিয়ে
শ্রেষ্ঠ সৌরভে চিতা কাঠ তাকে
আগুনের ঔজ্জ্বল্যে একান্ত আপন করেছে

চিরন্তন

পুনরায় ফিরে আসি আত্ম প্রতিবিম্বে
নির্ঘর্ব ছায়া নামে প্রকৃতির আঁচল ঘিরে
তখন অশ্রুর মত এক ক্ষীণ স্রোত

ঢুকে পড়ে আপন মস্তিষ্কে

অন্ধকার ভালোবাসি, ভালোবাসি ভ্রমণ

অকস্মাৎ আদিগন্ত ঘোর নীল অন্ধকারে
আত্ম অবয়ব ঘিরে দেখি তার একান্ত বিনীত অভিবাদন

উদভ্রান্ত সময়ের সম্মুখে দাঁড়িয়ে

আর কতটা উদভ্রান্ত হলে— নিশ্চিত প্রথায়
সুরা পাত্র হাতে আকণ্ঠ ডুবে যাওয়া যাবে

এ হেন, শোকের প্রকোষ্ঠে দাঁড়িয়ে— আমি
বড় বেশী অনুভব করি, একান্ত তাঁকে

যিনি অনুপম অনায়াসে তাঁর স্নেহার্দ্র হাত
একদিন স্নায়ুর গভীরে রেখেছেন আর একান্ত
এই আমি, এক সময়ে নিরীহ বাস্তু সাপ হয়ে
ঢুকে পড়ি, ক্লেদজ অন্ধকারে একান্ত আমার বাস্তু গৃহে

ধীমান চক্রবর্তী

ঝর্ণাউল্লাস

• ঠাণ্ডা হলুদ টিকেটের মধ্যে
পাওয়া গেল ফটোগ্রাফের চারটে
রেশম ডানা, ঝর্ণার ডান পায়ে
পরানো পাথরকুটির, গ্লাভস থেকে
থেকে উঁকি মারে প্রবাল মেয়ের
যুঁইফুলওড়না স্তন ঢেকে রেখেছে
নক্ষত্রচিহ্ন দিয়ে জোড়া দশ আঙুল,
না হ'লে বলা যেতো,—সে কিছুই পরেনি
শুধু নিজের লম্বা চুলের
আবছা শীতল পেনসিলছায়াটুকু।

চিন্তা যখন কোনও প্রতিমূর্তি সৃষ্টি করে
তখন তাকে লক্ষ করা যায়, ক্রমশ
সেই প্রতিমূর্তি নিজেই হয়ে ওঠে স্বয়ং
পর্যবেক্ষক, তারই মতো একাধিকের।

পাগল হয়ে তার ড্রয়ার ঘাঁটতে থাকলে
একে একে বের হয় টেলিগ্রাফের
এক্স-রে প্লেট, মাছ যে টুপি মাথায়
দিয়ে বের হয় প্রাতভ্রমণে, এক

দূরপাল্লার যান্ত্রিক ঘর মাখামাখি
দেশলাই কাঠি, আগুনে পুড়ে যাওয়া
ভিস্তিওলার কর্পূরমানচিত্র। এসব
হাতে নিয়ে বসে বসে দেখি একটা
লেবু গাছ যুঁইয়ের মুখে মুখ লাগিয়ে
ফুঁ দিতেই উড়োজাহাজের পিঠে
চড়ে উড়ে আসে ঝর্ণাউল্লাস
ও তার স্বপ্নমেয়ে আবীর বালিশ।

কুমারেশ চক্রবর্তী

ক্ষমা করো

স্মৃতি হাতড়ানো বিপন্ন মানুষের কাছে, কবিতা
কতক্ষণ গ্রহনযোগ্য?
কতক্ষণ তার অভুক্ত শিশু খিদে ভুলে থেকে,
তা' শুনে যাবে, আর, ঘনঘন হাই তুলবে—
ঘুমোনোর জন্যে!
রুক্ষ্ম নৈরাশ্যের মধ্যে এ এক রহস্য,
আমাদের চরম বর্বরতা...
তবু এও বাস্তবতা—অস্বীকার করবে কে?
যে শিশু কবিতার মানে জানে না, বোঝেনা
তাকে কি জন্মানোর অপবাদ দেব?

আমি কি জানি আমি কেন?
হেঁটে যাচ্ছি বাজারের দিকে—
হাতে বাজারের থলে, পকেটে পয়সা নেই
পুঁজি বলতে, শুধু জন্মগত অধিকার...
এবং এটাও এক ধরনের রহস্য, প্রতারণা
কেননা, যখন বাড়ি ফিরি—
থলে ভরতি আমি। পকেট ভরতি আমি।
আমিই বাজার। আমিই পণ্য।

দোহাই কবিতা আমার—
অপরাধ নিও না

শৌভিক চক্রবর্তী

খেলাঘর ভ'রে আছে

এই বুঝি শেষ হ'লো খেলা।

প্রিয়তম বন্ধুর চোখের তারায় ফোটে
অস্ফুট প্রশ্নচিহ্ন
তবে কি অবসর পাওয়া গেল
দীর্ঘতর গোল্লাছুট খেলার আসরে
একদমে কতদূর ছুটে গেছি আমি
এসবের চেয়ে দামি ফুলের কুঁড়িটি
ভেঙে কেন যে তুলিনি মেলে
রঙিন পেখম, ময়ূরের সাজে?
বড় বেশি অকাজের কাজে বেলা গেছে
আজ এই খেলাঘর ভ'রে আছে
নুড়ি ও পাথরে
এই বুঝি শেষ হ'লো খেলা
আজ এই সন্ধেবেলা নিজের সম্মুখে বসি
বারে বারে ফিরে আসে বেদনার
প্রিয় মুখখানি
জানি অলৌকিক উপায়ে আর ফিরবে না
সে, বলবে না খানিক হেসে,
আকাশে লেগেছে আজ রঙের উৎসব
এতক্ষণ লক্ষ্য করোনি?

আশির অন্যতম প্রধান কবি
তাপস চক্রবর্তীর একমাত্র কাব্যগ্রন্থ
একটি নীল আত্মা ও অন্ধকার ঋতু
কলকাতার হ্যামলেট □ ২০ টাকা

তমিস্রাজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

এই মর্মে সুলোচনাকে জানাই

মৃত্যু এখন আমার থেকে, তিন হাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকে, থাকুক
যখন ডাকব আমি, অনুগত ল্যাজ নাড়িয়ে আমার কাছে, প্রাজ্ঞ
সময়, অধীরতা, বোন তুলসীর ঝোপ পেরিয়ে হঠাৎ কোনো
নতুন অসুখ, এলেই হলো? ধমকে দেবো—
আমার খুব দুঃখ হচ্ছে, এই কারণে
শিল্পজাত জামা চড়িয়ে মানুষ
কেবল আড়াল খোঁজে অসংগত
খুঁজুক শালা। আমার অসুখ

(১) মগ্ন নির্মাণ আর আমার দাবনায় বসে নেই
(২) ০, ০, ০, জিরোর দূরত্ব বাড়ে, ব্যাস, ব্যাসার্ধ বাড়ে, বাড়ে রাত
(৩) বৃষ্টিতে রোদ্দুর হলে মানুষ বর্ণালী দেখে, অবাক হয় না
এইসব সম্ভাব্য জটিলতার সামনে মানুস দাঁতখড়কে নিয়ে দাঁড়ায়,
চিন্তিত। হ্যাঁ ও না মধ্যবর্তী অমোঘ "অখণ্ড-খণ্ডিত" সময় জুড়ে
কেবল দোলাচলের অবুঝ ফিচলেমি, অথচ এর মাঝে, হ্যাঁ ও
না'র মাঝে, হ্যাঁ-না/না-হ্যাঁ, in between কোনো কিছু হয় না।
হলেও মানি না। শেষ মুহূর্তের ঠাণ্ডা গরাদে গাল চেপে—
ঐতিহাসিক OUTSIDER — আমি তার ঈশ্বর প্রতিতী সম্পর্কে
নিরুত্তাপ R. D. X.পৃষ্ঠা ৬২ থেকে স্মার্টলি টুকলিফাই করি।
কি, না আমি হ্যাঁ ও না মধ্যবর্তী কিছু আছে কিনা কোনোদিন
ভাববোই না, কারণ সময় নেই। এই সবুজ Resort -এর সমস্ত
আমোদে আমি গেদে গেছি, আমায় জাগিও না। দালির 'হিট
খেয়ে হিটলার' ছবির মতই সমুদ্রতীরবর্তী অনুকূল বানিজ্যবায়ুতে
বালিতে পোঁদ দিয়ে বসে কাজু, কমলালেবু খাব/ সরাব পিবো,
মস্তি লিবো, চিন্তা করিব না। হিপ পকেটে অবুঝ সবুজ জড়ো
কোরতে এই আমি চল্লুম। DOWN, DOWN, CREATIVITY.

CREATIVITY নামক কচুপোড়া আমি চুল্লীতে দিই। যে CREATIVITY
মানুষকে দুরে সরিয়ে দেয়, ব্যবধান বাড়ায়, চুলোয় যাক—আমার
অসুখ।

দারুখণ্ড, তবে বেশ ডাঙ্গা, স্থির বসে থাকি
আমার AGNES, প্রিয় অপেক্ষায়, যে নীল
ভাদ্র মাসে পাড়ি দিলো, চোদ্দশো কি. মি.
(আইকম বাইকম পূর্বা ছোটে) -এ মাসে নাকি
গৃহস্থেরা কুকুর-বেড়ালকেও ফেরায় না,
সুখী গৃহস্থেরা, জন্মান্তিকে শোনা কথা
কাঙ্গাল ভিখিরিকেও ফেরায় না, তোমাকে
সবাই.....অগত্যা, দেওয়াল ধরো, গাণ্ডুবৎ
তুমি ছোটো,'মুগল-এ-আজম' দরবারে
একঠেঙে ডাকাডাকি, মাউথ-অর্গান নিতে
ভুলো না

বাংলা কবিতাকে অন্যতর মাত্রা দেয় যে কাব্যগ্রন্থ
সালভাদোর দালির নীল
শ্রীধর মুখোপাধ্যায়
কবিতীর্থ □ ২০ টাকা

রাজা দাশ

এখন কটা বাজে

উড়ন্ত পাখীর শরীর থেকে ডানা খুলে যাচ্ছে, এখন বিকেল পাঁচটা
ঘুম পাচ্ছে
জানি আমার হলুদ
দুলছে, ব্রীজ দুলছে।
ট্রেন আসছে, একি ট্রেনের মত ঝড়ের মত বিনীতার মত
আসছে বিনীতা আসছে।
ক্যানো আসবে।
টেলিফোনে বমির কোৎ, দেখা করে না স্বীকার করে না
বুকের মধ্যে জিহ্বা লুকিয়ে কাঁদে আর বুকের চেহারা বুকের মরণ কে দেখেছে।
ক্যানো একবার নেমে এসে চীৎকার করে না সস্ থেকে
যদি ছোট্ট ফ্রীজে নীল মাথাটা চীৎকার করে
ভোর ভোর ভোর

দরজা খুলি, পাখীটা ডানা ছাড়াই উড়ে যাচ্ছে, এখন সন্ধ্যী ছটা
ফিল্টারে জল নেই, ষ্টোভে তেল নেই পাচ্ছে ঘুম, পাচ্ছে,
সরে যাচ্ছে ব্রীজ ব্রীজের সাথে নদী বা ব্রীজের জন্য ফাঁক, খাদ
সমুদ্র ওয়াশিং মেশিন সরে যাচ্ছে বিনীতা।
সরবে না।
তার আগে কপাল ছুঁয়ে দেবে আঙুলের উন্মাদ গোলাপী মাংস
চেপে ধরবে মুখ কত আর ছটফট করা যায়। পেট্রোলভেজা মশারী
তবু উচ্চারণ করবে না য্যানো উত্তাপই সব, ঝলসানো
—চেতনায় সবুজ ভাতের সবুজ ফ্যান।
যদি ঘুমের ট্যাবলেট সরিয়ে দিলে অন্য কোন ঘুম
ছুরির মত ব্লেডের মত মনের মত
—বীনিতা হেসেই যাচ্ছে

শর্মী পাণ্ডের লেখা

চৌকরী □ ৯৭

নিরুপায় বোধের ভেতর কিলবিল খেলা করে
চলকায় সব রঙ তবু সামনেটা ঐ পুরোনো
সবুজ থেকে গেলে চোখের সব স্লাইড খুলে
ফি-টারে ভ'রে দিচ্ছি বিষ বন্ধ সকালের
আর স্ক্রিন জুড়ে মধুর জমাট শব্দের ছেনালী

তরঙ্গে ঝিন ঝিন বেজে যাওয়া সব অচেনা শরীর
আর তাল ক'রে তুলে রাখা মাটির হেলিপ্যাড ঘিরে
বহুদিন পড়ে থাকা শীতের ছায়ারা উড়ে আসে
সোনালী চাদরে ঘুমের ভেতর
এমনি কোন রোদে মাকড়শার চলন দেখে
নিস্তব্ধতা চিরে চিৎকার ক'রে ওঠে
হাড়ের সঙ্গীত আর অনেকটা সকাল
দুহাতে চ'টকে হাউই মেঘের মতো
ছুঁড়ে দেওয়ার জন্য স্বাদ বদল নইলে
ভরা থাক
শূন্য বোনেটের দোমড়ানো খাঁচার ল্যামিনেটেড
আকাশ জুড়ে চোখের ভিটামিন পুষ্ট সব ছবি
আর
ল্যাণ্ড স্কেপের ধারে এক সুন্দরী গাভীর অবিস্মরণীয় হাসি

কিছুটা কালো স্পর্শ করুন

Information Centre

শর্মী পাণ্ডে

একটি গ্রাফিত্তি প্রকাশ

রঞ্জন মৈত্র

শব্দ জংশন -৯

আগুন জামার মধ্যে কোন নাম নেই
কখনও বরফ কখনও অন্ধকার ছুঁয়ে দেয়
মাথা হারিয়ে দিচ্ছে পা-কে
নাম মুছে ফেলার পর কদম ফুটছে কি
ফুটছে না, শিখাকারের হাওয়া কাটে মাত্র চোখ।
ঝাঁপিয়ে পড়া মুখ আর ডানার আবছা
পাড়া, গুয়াবাগানের পাশে ঢেউটিন, কথাবলা
সিঁড়ি, গান শুনে খুশী হওয়া মেয়ে আর
ছেলে অন্ধকার। ছোট ছোট আগুন থেকে
সুস্বাদু আঙিনা, একঝলক মুখ। হাত নেড়ে
কিছুটা হারিয়ে দেয় এক একটা বাড়ি।
শূন্য পাওয়া মাথা তখন পথ পুড়িয়ে
লকলকে ক'রে তুলছে পা-কে। দু'পাশের
ঝাপট থেকে, রেডিমেড থেকে, শূন্য হ'য়ে
ওঠা ছুটের আর মনেপড়া নেই। সিঁড়ি
নেই। দোতলা বেতের চেয়ার। পায়া নড়িয়ে
মিশে যাচ্ছে ছেলে আর মেয়ে। বাড়ি
ফেরবার হঙ্কা বোতাম হয়ে ছুটে আসে
উলের শরীরে।

শুভঙ্কর দাশ এর একটি না-বই
যা নির্দিষ্ট পাঠকের জন্যই কেবল
একটি সাদা BLACK BIBLE
দেশী মুরগী, এ্যাই গরু হ্যাট্
গ্রাফিত্তি

প্রবাল কুমার বসু

বিষণ্ণ ময়ূরী

সাধ্যমত একদিন ভেঙে ফেলি স্তব
ব্যবধান দীর্ঘ হয়, দীর্ঘ হতে থাকে
উঠোনে নিমের চারা, ইটেবাবুইয়ের রব
কারা যেন বলে গেল ওঠো...এ প্রভাতে
ঘুম ভেঙে জেগে দেখি নষ্ট হয়ে যায়
সাধ্যমত আগলে রাখি আড়ালে নিজেকে
দেহখানা পড়ে থাকে অচেনা লোকালয়ে

পাজামার আড়ালে তখন শুরু হয় দিন
ঢিলেঢালা, পাটক্ষেতে দড়ি খুঁজতে যাই
মিথ্যে বন্দনা করি ইষ্ট দেবতাকে
টেনে দিল সীমানা কারা ময়ূর পালকে

সেই থেকে হাঁটাহাঁটি দুদিকে দুজনে
পরী এসে রেখে গেছে তার দুই ডানা
মুখ গুঁজে পড়ে আছি ময়ূরীর স্তনে
মাঝে মাঝে দেখে যাই ঠিক আছে কিনা
কতটা বন্ধুতা হল...

সম্পর্ক নীলাম হবে ঠিক হচ্ছে দর
পাজামার রঙ কারা বদলে দিয়ে গেছে
বড় হয়ে জেনেছি ছিল ওরা গুপ্তচর
দুজন বেয়াকুফ বলল কিনে নে শালাকে
ভরসা করেছিল ওরা কীসের ওপর
ওদের টেক্কা দিল ময়ূরী ময়ূর
পারদে চড়তে থাকে ক্রমে উচ্চস্বর

প্রতিদিন এভাবে বদলে যেতে যেতে
দিনের মধ্যে ঘুরি আট দশ হাত
বাল্যের কিশোরী যে একদিন ফিরিয়ে দিয়েছে আমাকে
সে-ও কিনে নিতে চায় এমনই বরাত

পৃথিবী ঘুরেই চলে নীল ছবির রিল
অন্ধ হয়ে যাচ্ছি দুই চোখ শঙ্খচিলে
খুবলে নিয়ে গেছে ছিল যা কিছু স্বপ্নিল
আমার জন্মের ছক আঁকা ছিল জাহাজে মাস্তুলে

জাহাজটাই কিনে নিল একদিন বিদেশী নাবিক
ভেসে গেল জন্মের রাশি, বন্দরে বন্দরে
যখনই যেখানে গেছি সকলে ভেবেছে আমি তাদেরই নাগরিক
দেশ কোথায়? আমি তো আমার বাড়ী-খুঁজে যাচ্ছি দেশে দেশান্তরে

আমি তো আমার বাড়ী-খুঁজেছি অনেক মাঠে, খুঁজেছি বাগানে
ময়ূরী দেখলে বুক থেকে আমি পালক ছিঁড়েছি
আমার বাড়ীর কথা লেখা আছে ময়ূরীর স্তনে
ময়ূরী দেখলে স্তন নেড়ে চেড়ে ঠিকানা খুঁজেছি

সেই স্তনবৃন্ত থেকে একদিন ফুটেছিল পারিজাত হিরণ্ময় গোলাপ
সেই স্তনবৃন্ত থেকে একদিন বৃষ্টি ঝরেছিল ফোঁটা ফোঁটা
সেই স্তনবৃন্তে কারা একদিন দেখেছিল জ্বলতে আগুন
সেই স্তনবৃন্তে হাত রেখে কার পুড়েছে কররেখা

আসলে বদলে যেতে, প্রতিদিন বদলে যেতে যেতে
ঠিকানাও বদলে গেছে, কতবার বদলে গেছে বাড়ী
সওদা করে দিয়েছে পরী ডানা তার অনাবশ্যক শোকে
এখন বেঁচে থাকতে প্রয়োজন অলৌকিক চাতুরী
আলোয় শোকাচ্ছি দেহ পোড়াচ্ছি মৃণ্ময় শরীর
তবুও স্বাস্তনা নেই এত আলো ছাড়িয়ে অন্ধকার
গ্রাস করছে আমাদের, আমরা তো মূক ও বধির
ক্রমাগত সয়ে যাচ্ছি বিষন্নতা উটের গ্রীবার

সহ্য কর সহ্য কর —যেইভাবে সহ মাতৃভাষা
একদিন নিশ্চিতই পূর্ণ হবে অভীপ্স বাসনা
সাঙ্গ হোক পর্যটন খুঁজে যাচ্ছ আলোর বিবমিশা
দেহখানা ছুঁয়ে দেখ সত্যিই নিজের ছিল কি না

দেহখানা ছুঁতেই স্বপ্ন ভেঙে গেল, ঘুম থেকে উঠে
দেখি পুড়ে যাচ্ছে শবদেহ তারই আলোকে

একবার নিজেকে দেখি, একবার নিজের শরীর
কতটা অক্ষত আছে কতটা ময়ূরীর

উড়ে যাই ধার দাও ময়ূরীর ডানা
আমাকে সকলে বলত...ওইখানে তোমার ঠিকানা
ওইখানে...দূরে মাঠ ঝাপসা হয়ে আসে ঘরবাড়ী
একদিন ওইখানে আত্মহত্যা করেছে ময়ূরী

আসলে নিজের নয় ময়ূরীর শব
ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখেছি পুড়ে যায়
সাধ্যমত ভেঙে ফেলি ব্যবধান স্তব
উড়ে যাই ফেলে দেহ অচেনা লোকালয়ে
বিছানায় পড়ে থাকে ময়ূর পালক

আশির প্রজ্ঞাবান কবি
শুভব্রত চক্রবর্তীর
বহুপ্রতিক্ষিত কাব্যগ্রন্থ
এই শীতেই
বলো বৃক্ষ, পাথরপ্রতিমায়

শ্রীধর মুখোপাধ্যায়

আমার সাঁতার

পিত্তল গোধূলিতে শূন্যচোখ থেকে বেরিয়ে অভ্রনীল ঘোড়াটি ওই
হেঁটে যায় বন্দুকগলির দিকে
কোনদিন ছোট ব্রিস্টল কিম্বা খালাসীটোলা
অথবা একছুটে সোজা পার্ক, অলিম্পিয়া আহা—
গোটা দিনটাকে দুমড়ে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে
ঘাসের মূলের ঘ্রাণ নিয়ে
কিম্বা খুঁজে নিয়ে গঁগার তাহিতি রাত, চর্চা হবে নন্দনতত্ত্বের
আর মাঝে মাঝে হিমঘর থেকে চেঁচিয়ে উঠবেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়
ঃ মদ দাও, দাও অগ্নি ও সোম।
একবার ঈশ্বরের সঙ্গে দেখা হলে ভাল হয় আজ
বে-আইনি মদ খেয়ে দুই ভাই গোয়ালিয়র মনুমেন্ট থেকে
গঙ্গায় ভাসব; ভেসে যাব দূরতর মোহনার দিকে

রাত তো হয়নি কোনদিন অশ্বের নিদ্রাহীন রাতে
দূরে কাছে ছোট্ট মেয়ের মত কলকাতা ঘুমোয়, মেট্রোর সুড়ঙ্গ
দিয়ে এসময় সুরধনী বয়
আর ময়দানে নামে কিশোরী পরীর দল,
অদ্ভুত ফুল ওরা, অবচেতন জ্যোৎস্নার ফুল
অযৌন সম্ভোগে সতীচ্ছদ ছিন্ন উহাদের—
ঈশ্বর চপল বড়ো, ঘোড়াটির অজর দোসর;
কিভাবে নিশ্চিন্ত হল পুষ্পিত এই রাতে
কলকাতায় এইচ. আই. ভি. নেই!

কালীঘাট ব্রিজ থেকে উঠে রামধনু সপ্লিল এক
নেমে গেছে জয় মিত্তির স্ট্রিটে—
ওরিয়েন্টাল সেমিনারী থেকে বাবা বই হাতে বেরিয়ে
আসছে, দাদু শোভাবাজার ঘাটে ছাব্বিশ মাইল সাঁতারের
মহড়া টানছে আর দুহাতে প্রজাপতি ধরতে ধরতে
আমি হেঁটে যাচ্ছি আগ্রাওয়ালী বিন্দিয়ার ঘরে।

'কলকাতার হ্যামলেট' বুকে করে বৈদ্যুতিক তাপস
কলকাতাকে অগ্নিসুরে বাঁধে আর শুভব্রত প্রভাময়, ওয়েলিংটন স্কোয়ারে

তারাদের অজ্ঞেয়বাদ বোঝায়
আমরা তিনজন, '৮০র কলকাতার তিনটি ঋষি অমরত্ব তুচ্ছ করে
মুহূর্তকে রূপময় করি, ঐশ্বর্য প্রদান করি রোজ ছন্দ ও ধ্বনিকে—

বণ্য ও রোমশ ঘোড়াগুলি সাদা, সারারাত এসপ্ল্যানেডে ঘোরে
অভ্রনীল ঘোড়াটিও যায় তাহাদের সাথে—চেটে নেয়
বিয়র, কিংফিসার, অম্লান অলকানন্দা।
আর তখন বড়সড় কোন পাপ করতে না পারার আক্ষেপ
দক্ষিণেশ্বরের দিকে ছেঁড়া ঘুড়ির মত উড়ে যায়
অপূর্ব মেয়েরা সব পুজো সেরে কার্জন পার্কে বসে
—এ শহরে কার্পেট বোম্বিং নেই, এবোলা ভাইরাস কিম্বা
টাইফুন নাচ, নেই ঋতুহীন চিত্রকর শব অথবা
ট্রট্স্কি নিধন— তিনশো বছর পরেও
কলকাতা আপ্লুত বিবি
আজ রাতে স্বয়ংবরা হবে...

তবুও আগুনটা শুরু হয়ে যায়
কলেজ-ক্যাম্পাসেই হাতেখড়ি মলোটভ্ ককটেল, বারুদ-আবির।
আর চলে গেল কফি হাউসটা আমাদের হাত থেকে
লুম্পেন ও মুৎসুদ্দিদের হাতে।
বিষণ্ন কুয়াশায় ভেসে যায় কাগজ তরণী এবং
কাশফুল দেখে ঐ কান্নার ঢেউ মহালয়া দিনে—
তখনই তৃতীয় দীক্ষা ঘটে যায় আমাদের,
চার্বাক দর্শন, রোজা লুক্সেম্বুর্গ আর ইয়ুং নিয়ে খুব হইচই হয়
.....

আজি যুদ্ধ করি, উড়ে যাই,
মধুসূদন ও গিরিশের শ্রেনী-অবস্থান বুঝি,
বইমেলা ছট্‌কে গাঁজা পার্কে কিয়ের্কেগার্দ, কনাদ নিয়ে
সমদ আলোচনা আর প্রফুল্ল বিষাদ—
কতই দেখোনি সক্রেটিস্; কলকাতা দেখোনি তুমি,
দেখোনি হিজড়ার যৌনকাতরতা, কম্যুনিষ্ট কেরানির সংসদীয় নাচ,
দেখোনি বইপোড়ানোর উৎসব, ক্যালকাটা ক্লাব থেকে
দেশপ্রিয় পার্কে সম্ভ্রান্ত মেয়েদের তীব্র ধর্ষকাম—

তবুও ঐ ঘোড়া মাঝরাতে ভীষণ লাফায়
এখানে ব্যাকাস নেই, সে-ই নিজে মদের দেবতা—
এ্যাকাডেমি তছনছ ক'রে, ছিঁড়ে দিয়ে রঙ্গিনী আর্ট
খুঁজে ফেরে মিরোর স্তব্ধতা কিম্বা রুশোর আত্মমগ্ন রাত
.....

রঙ! রঙের ভীষণ হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে অস্তিত্ব-জ্বালা আর
কালের প্রাসাদ
আমি হাঁটছি নীল-সবুজ ঐ প্রান্ত রেখার দিকে
ভাঙছি সভ্যতার ধাতু, শিল্প ভ্রষ্টাচার—
অভ্রনীল ঘোড়া এক বন্দুকগলিতে যায়,
ঈশ্বরের সাথে একবার হল্লোড় করবে বলে
সারারাত পার্ক স্ট্রীটে জাগে—

কে যেন ছিঁড়ে দিল হ্যাণ্ডমেড পেপার চড়চড়
শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল ক্যাম্‌লিন্ রঙ ; ছবি নয়
শুধু পোষ্টার লেখার জন্য তুলিগুলো বাচ্ছা পাড়তে থাকল
বছর বছর— আমি ছবি আঁকলে কি এমন ক্ষতি হোতো সখা?
—এখন ছবিগুলো ফোটেনা কাগজে, কেবল রঙেরা, ডানামেলা
আফ্রিকান মিথের চরিত্র সারাদিন আমাকে নাচায়
রঙের প্রসাদে আনি ক্ষুধাহীন, তৃষ্ণাহীন—প্রসব-যন্ত্রণা নিয়ে
শুধু বছর বছর—
ক্ষতি করে নিজের, ক্ষতবিক্ষত করে ঐসব না হওয়া ছবি
রঙের তাণ্ডবে আমি কিভাবে বাঁচব!

ভয়ংকর বৃষ্টিতে পাতিপুকুর-ম্যানহোল প্রায় সবটা টেনে নিয়েও
আমায় ফেরাল, মৃত্যুর কাছ থেকে ঐ ফিরে আসা, বাঁচা—
বাঁচলাম ঐ রঙের যন্ত্রণা নিয়ে আরো কিছুকাল দগ্ধ হব বলে
বাঁচলাম তোমাদের এলিট-কালচারের গায়ে বমি করব বলে
বাঁচলাম, বাঁচাল মদ্যপ ঐ আমার ঈশ্বর।
সারাজীবন বই ছবি আর মদ ছাড়া কিছুই বুঝিনি
তবুও মাতালই নাম হোল পছন্দসই মূর্খ ইন্‌টেলেকচুয়াল
আর অফিসের বাবুদের কাছে—তা হোক, কন্যা ও মাতার
যোনিলুব্ধ ঐসব হায়নারা কলকাতা নন্দনে যাক

পায়ুমৈথুনের রেশে কিছুকাল আরো কিছুকাল শুকরীর
ল্যাজ চেটে যাক—
কিছুই জানলাম না ঠিক এতটা জীবনে
আর্য-অনার্য ধারা, দর্শন ও মনোবিদ্যা বুঝতে বুঝতেই চৌত্রিশ
বছর পেরিয়ে গেল
তবু শ্রেণী-ঘৃণার স্বপক্ষে আমি, পেশাদারিত্বের বিরুদ্ধে আমি
চিৎকার করছি,
আমাকে লিঙ্গহীন করলেও একে থামানো যাবে না।

ফ্রয়েড পড়েছি ভায়া—কিশোরীর চাল ধোয়া সাদা হাত ফাত নয়
কিশোরীই ভাল লাগে বেশ
কবিতা পত্রের জন্য নয় এসব জীবনেই ভাল
ধান সিঁড়িও দেখিনি আমি, তেমন আবেগও নেই
শুধু বুঝি পুঁজিবাদ ও মানসিক পঙ্গুতা কেমন সাহিত্য চায়
আর কিভাবেই বা ভ্রষ্ট আত্মারা প্রতিষ্ঠান কুক্কুরীর
তির্যক প্রতঙ্গকে ভাবে স্বর্গের রাত—
শ্রেণীর চেতনা নেই মুগ্ধ তারা কপটার শ্রোণীর কম্পনেই
কিভাবে বুঝবি তোরা কাম্যুর 'বিদ্রোহ', সার্ত্রের 'বমনেচ্ছা' কিম্বা
এলিয়ট, পদ্য প্রভাময়—

গ্যাট্ আর আই. এম. এফ. কুরে কুরে খাচ্ছে স্বদেশ
কোক্ আর কেন্‌টাকি বদলে দিচ্ছে অহং এর বোধ,
বিদেশী টিভির দৌরাত্বে ভেঙে যাচ্ছে অনুশাসন
আর সাইবার স্পেশে ভাসমান শৈশব-কৈশোর—
তখন উদ্দিষ্ট ভোগী বাংলার বুদ্ধিজীবীদল বিড়লা সভাঘরে
আমাদের মূল্যবোধ শেখাচ্ছে—
এখনো আত্মহত্যা করিনি
এখনো পাগল হয়ে ঘুরিনি শিয়ালদায়
এরজন্য প্রণাম পিতামহ—

ঘোড়াটি দৌড়ে যাচ্ছে
দৌড়াচ্ছে ঐ সাদা ঘোড়া মেটালড্ কলকাতা পথে
ও কি চলে যাবে বৈশালিতে নাকি ও জেনে গেছে
ঘুমের ওষুধ নয়, অবচেতন গহ্বর নয়, নয় লালমদ
কলকাতার শেষতম সবুজেই আছে উহার আশ্রয়!

বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি, বৃষ্টি সারারাত
আজ রাতে ঘরে কেউ নেই—খালি পেটে মদ খাচ্ছি,
মদ খেতে খেতে ঈশ্বরের হাত থেকে পদ্মফুল কেড়ে নিয়ে
তাকে কখনো তলোয়ার কখনো প্রজাপতি করে দিচ্ছি
ফ্রিজের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে
হিমায়িত আদিম মানবী এক,
ঝনঝন শব্দে ভেঙে যাচ্ছে টিভি, বইএর দল শব্দহীন
গানে তৈরী করছে মেরুণ কুয়াশা
আর ফ্ল্যাটসুদ্ধ গোটা বাড়িটাই ভাসতে শুরু করছে
বঙ্গোপসাগরের হাওয়ায়
মদের বোতলে মাছ হয়ে ঘুরছে সময়ের দেবী
আমি নীল তিমি হবার বাসনায় পরে নিচ্ছি ভেজা জুতো,
তৃতীয় নয়ন।
ঝড়, কি ভীষণ ঝড় হঠাৎ আছড়ে পড়ল সময় শরীরে

আমি ঘোড়া নাকি নীল তিমি সঠিক জানিনা
কলকাতার এই শেষ রাতে উপদ্রুত আকাশে, আজ শুধু আমার সাঁতার

২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬

বিতর্কিত সাংবাদিক ও গদ্যকার
অজিত রায়ের নির্ভীক ইতিহাসচর্চা
ধানবাদ ইতিবৃত্ত
ফার্মা কে এল এম □ ৭৫ টাকা

শুভঙ্কর দাশ

চরসের গান

এবার তাহলে গতি হোক হে ঈশ্বরের ধোয়া তুলসিপাতা এক কামড় পেনের নজর
পেড়ে ফেলছে তাকে। এই সাক্ষী এই সন্ত্রাস গড়িয়ে চলেছে কতদূর?
শেষে একটা দীর্ঘ দাগ মাত্র। এমন সাজা এমন পাতানো বোধ কোনো
ঘরকন্না তাকে দেবে...

স্তব্ধতার ভাষা প্রকাশ অনেক খোঁজ জানে
জানে তার প্রেমের সময় কাটা আছে
আর জ্বলিবে না হায় তার তারা

কেমন করে আছো মৃত্যু জ্বালিয়ে
ঘুমিয়েছে বাকলের প্রেম ঝরে গেছে
ছাল চামড়া ছাড়ানো একটাই এখন পাইন

নীলে বিঁধে আছে মৃত
একটা মৃত্যু নিয়ে
ছেলে খেলা করে সে বসে থাকে

ধাবার কাঠের পরশ তার ভালো লাগে ফের এই স্তব্ধতর ছুট
এই কাঠের শিরার ভেতর সমস্ত ঠাণ্ডা আর
বছর বছর ফুলের বোকামো হলুদ ফুটে আছে

টিপিকাল ছাল তুলতে তুলতে সে আরাম দেয় নিজের ভুলের সময়
মনে পড়ে কত আরামের গাথা। লক্ষভরী সোনার মৃগ গন্ধে পাগল
তাড়া করে অথচ নিজেকে খুঁজে পায় না কিছুতেই
কোনো বিষয় পৌঁছোচ্ছে না আর কেন তবু দৃষ্টি প্রখরতার কাছে নতজানু এখন
সুন্দর বেলা হবে রোদ ফুটবে
ঝাঁপিয়ে আসছে আসতে চায় দেখে সে ঘন অন্ধকার
তার বেলা কাটেনি কেন কি করছে সে তখন
কসুমিত তার কাল ছিলো অমন গন্ধ শোক সে ভুলিবে কি
কতটুকু তার কতটুকু চেয়ে নিতে পারে চিনে নেবে
তখন পুড়িছে বাতাস অন্ধকার আর ছুটে যাচ্ছে জল
তাকে ঠেলে কতদূরে সেই গতি অহমিকা পারার অথবা নেহাৎ না পারার কাব্য
তার জন্যে তুলে রাখা অথবা কার জন্য বনবাস সইয়েছিলে

বিশ্বাস কঠিন অথবা বিশ্বাসকে কঠিন করে তোলা
সাদা ঘোড়াকে তখনও হলুদ মাখানো চলছিলো আর জরি আর সাজ
সেইসব একঝলক মানুষের কাছে যাওয়া বাকিটা পাথরের সূর্য ফুটে আছে
ছবি তুলবেন না প্লিজ দেবতার অপমান হবে
খানিকটা লোহা বাঁধানো এই সমতা রেখেছি তোর তরে হে মহামহিম
দানা ছড়ানো এই শোক সভায় সে চাইছে ভেসে থাকতে চাইছে
লোকে তাকে ভালো বলুক এ্যাতটা শোক তবে কার ছিলো
আদৌ কোনো শ্বাসের এদিক ওদিক কফি ব্রেক ঘটলো কোথায়
এ্যাতগুলো মানুষের ঠাণ্ডা ভেসে আসে
এ্যাত দূরে যাকে হনুমান টুপি দিয়েও ঠ্যাকানো যাচ্ছে না

সময় সাজ বিনা ঠোঁট ফাটা বিনা লাফিয়ে উঠছে রাস্তা
তাকে বুকে আগলে আগলে কোথায় যাবে
ঘড়িরা থাকে বারান্দায় বসে স্বপ্ন দেখা
দেখার চেষ্টা করা যাক বেষ্টনী এই ঘেরা দুপুরের গন্ধ
আর উঁকি তাহাকে বধিবে ফের রয়ে গেছে এমন পাতাও সে জানে
শুরু হলে কবে শেষ হয় অথচ অপেক্ষা অসহ্য হলে গায়ে মাখবে কি
এবার দরজা বন্ধ করে রাখো পাছে ঢুকে পড়ে নীরবতা এ্যাতটা চুপ একসাথে
সহস্র ইচ্ছা কেন শব্দ হয়ে ঝুলে থাকে ঘণ্টার ধ্বনি কেন বাজাও
সেঁধোবার ফাঁক খুঁজছে হু হু রাত
ঘোঁড়াগুলো এখনও ঘাস খাচ্ছে ঘণ্টা বাজিয়ে
মহিন বা অন্য কারো হলেও তো ক্ষতি নেই যতক্ষণ প্রান্তর আছে
অনেক ঘাস ফলে আছে পালিশ ছাড়াই

মাথার কাছে খুলে ধরছে কুয়াশার ধোঁয়া
পাক মেরে সেঁধোবেকি একদম অচেনা এই মেঘ
ইচ্ছেগুলোকে টিপে মারার কৌশল
শিক্ষা করা ভদ্রজন আদাব ইত্যাদি
তোমার জন্য রেখেছি জীবনের সুধা কতক
চরসের গান সেইমতো বেজে ওঠে
ওগো সূর্য তুমি উঠে দেখ জীবনের দেনা কাটে কিনা
একদলা চরসের বদলে টফি চাইছে যে শিশু
আমি তার আত্মা বিকোবো বলে উঠে পড়েছি ভোর থাকতে
এই বোধ কোনো অসহায় এইসব শব্দ শব্দ ক্ষয়

আমাদের চেনে কি মতলবে ঘণ্টা ভন্ ভন্ বেজে চলে
অতএব ঘোঁড়ারা গোচারণে যাবে ঘাস খাবে আর হাগবে প্রান্তরের মাঠে

পাহাড়ের মাথায় যারা কুঁয়ো খোঁড়ে কেন খোঁড়ে
হৃদয়ের তাপ হালকা করে আবার বুজোনো শোক গাথা
এইতো জীবন ছিলো ওলার চড়বড়ে কবে আসবে জল
আর বাতাস কবে আসবে আরো একটু হৃদয় এই শীতে
ওদিকে সমানে ঘণ্টা বাজিয়ে গাধাগুলো মহিনের ঘোঁড়া হবে বলে
প্রাণপণ লড়ে যাচ্ছে মাইরী এবং সাথ দিচ্ছে সরকার বাহাদুর
কোটি টাকা উড়িছে বাতাসে — ধরো — ধরো —
এমন শামান এমন ল্যাংটা সাধু
কম্বল চড়িয়ে প্রসাদ বিলোবে ওই
পানামার লম্বা প্যাকেট কেউ ভেট দেবে তার জন্য জিপে এইমত
কালামুনি বাবা কালীর ভজনা করে করে দুটো কুত্তা পুষেছে
মাগী পুষেছিলো কিনা তাহা জানা হয় নাই অথচ ওইখানে
প্রচুর বাচ্চা দেখিয়াছি এবং একটি চায়ের কুটির থেকে
দুটাকায় চা নামক গরম বস্তু এক লোকে খায় দুহাত বন্দী করে
বস্তুর টান নাকি ছাড়ে না মানুষে

মানুষের গতি তাকে কে দিয়েছে
চরসের ঢেলা তাকে কে দিয়েছে
এবং তখন চুপ সন্ধ্যা নামে
পাখিরা যে যার জলটল খেয়ে উড়ে গেছে ফিরে গেছে
গেরস্থ চড়াই চেয়ারের সাধ ভন ভন করে বেজে চলে
বেজে চলে গরু গাধা ঘোঁড়া মানুষেরা একটানা

সমানে ভেসে চলে নৌকো হালবিনা কি অধ্যায় রচিবে তার ভাষার মন্দ্র-মন্থর
যুবকের রাগ তাকে নাচিয়ে ছেড়েছে এই উঁকি জন্ম-জন্মান্তর রয়ে গেছে
স্তব্ধতায় ওগো সুন্দর হে এই পাহাড়ের সবুজ আর বরফ শুয়ে থাকা
চেনে নাতো চেনে বেঁচে থাকার পরাগ নাব্যতা গাড়ির কাঁচ আর হেডলাইট
ওপাশে মেঘ জমছে আবারও ওলা ওলা সুন্দর হে রোগ যেমন ভেঙেছে
মন্দিরের সেই সময় সেই সঙ্গীত কতবার আরো কতবার কান লম্বা হতে হতে
ঘাসের মতন কাঁপে লতানে পাতারা ধরে নেয় এই কালো ঢোকানো
মস্তিষ্ক জানি কার জানি কার হলে এই থেমে যাওয়া চুপ ভেঙে যাবে

পরাগ কতবার এসেছে সুন্দর হয়ে আর জলের ক্রমাগত জড় হওয়া
গড়িয়ে গড়িয়ে সে দেখে দেখে আরো কিছুদিন যেমন জীবন যেমন
সবুজ প্রান্তর মানুষের মেঘে আর ভেজে ঢেকে যাবে সব কথা সব
কথকথা এইখানে আরেকবার আমি গতির কাছে ধরা দেবো
এইমতো সুবিধের মত চিরে চিরে এগোনো থামাবে
কাকে কাকে দেবে ঈশ্বরের মেঘ সময় হিসেব গড়ে তোলে নাতো
গড়ে তোলে হৃদয়ের তামাম প্রাসাদ তার মনে পড়া থামাবে না
থামাবে না একদিন দীপ জ্বালা

ভাঙ পাতার বিচি আর পুদিনা পাতার বুনো চাটনির
সাথে রুটি আর টক নামো নেশা
আহা মাথাটা আবার ঝাঁ চক্ চক্ হবে এই বেলা

Death, he reflects, is equivalent to a declaration of
spiritual bankruptcy

এখানে স্রোত তাকে ডাকে
আঙুলে ঘঁষে ঘঁষে মেখে নেবে রস এইসব পাতারা প্রজাপতি
সব সম্পর্কের শেষে কেন থেকে গেল এত জল
এত ঠাণ্ডা নেভানোর তামাম ওষুধ
কাঁচ পুতুলের মোম ঝরে পড়ে তাহার নিষেধ
থাকো জন্ম দাও ওগো দাঁড়ের পায়রা এইবার বঁচিয়া উঠিয়া
তার মন কেমন করে তখনো পায়নি সে ওই উঁকি ওই দেখে ফেলা
একাকিত্বের মেটে তার ভেঙে যাচ্ছে
হাজার হাজার চোখের ফাঁকে তার দৃষ্টি হারাবে কি
সে ফাঁকি দেবে দেবেইতো এই ডাক সে শুনতে শেখেনি
মাথার জন্য তার দামহীন এমন সন্ধ্যা গেছে
সে কেন এই দান গ্রহণের তরে রাখিয়াছে সেই মতো ভালোবাসা ছিলো
সেইমতো হিসেবের কড়ি ঝকড় ঝকড় নাড়াবে কেগো বসন্তের বাগ
জাড়ে এইখানে ফুটিতে হইবে এইখান থেকে তাকে চিনে নিতে হইবে কি
বা সকল সময় সেই অপরাধ আমার আমার বলেও
এ্যাত হাঁকপাঁক থেকে গেছে মলিনতা ওগো ওগো জলের গ্লাস
তুমি ভরে দাও এই বুক সবাকার কাঁচে
আরেকবার মাথা আরেকবার পিছোবার জন্য তৈরী থেকো

সেকি দেখিবে হায় এভাবেই হঠাৎ এ্যালাস হয়ে গেলি
এখানেই দেগড়ে আছে মাছি
এইখানে শেষ অবধি পালানো গেল না
এইখানে এইখানে এইখানে
নমো শক্তি নমো শক্তি নমো শক্তি
নমঃ নমঃ
হাত বাঁধা আছে এ্যালাস তার কতটুকু ধরিতে পারে আর
অজানার চোখ ডেমরে আছে ওই
কর্ম-কর্ম যোগবিয়োগ গুণ শেখেনি সে
এ্যাতদিনেও না তবে এইমাত্র একটা চশমা একটা ফুঁটকি নামিয়ে রেখেছে
খুলে রেখেছে পাশাপাশি শিরা উপশিরা রোদ এলে দেখবে বলে
ড্যাম্প এখন কাঁদিও না তাপ দাও তাপের প্রহর কেন কাঁদেনা আবারও
সেইক্ষণে আবার লিখিয়াছি
সেইক্ষণে নুনু ধরে টানটান করিয়াছি
ইহাই জীবন শুনিয়াছি
একদম স্রেফ ধোঁয়ার মত মেঘ
দেখিয়াছি
দেখিয়াছি কুয়াশাও নদীর মতন
পড়ে থাকে এদিক ওদিক
অসহায়

অস্তিত্বহীন তবুও অপার রোদ চাই বলে খানিক সাহায্য চাই
বলে চামকি দেখিয়েছে যা যথার্থ দেখাবার
বদ গন্ধ সহ্য হয় না দরজা এঁটে বসে থাকি
যায় যন্ত্রণা তারও হয় এমন ক্ষুধায় তাকে ডাকে ডাকা যায়
আকাশের পালক অথবা কোনো কিছু পাক খায় একটু কাঁচের দৃষ্টিপটে
এমন বোঝার কাল এলো যাবে তো ঠিকই একদিন
পৌঁছোবার তরে সে রয়েছে এগিয়ে
এই একটু বেঁচে থাকা সে জেনেছিলো
এই একটু হাঁফিয়ে এগিয়ে থাকা
পিছনের দিকে তাকিয়ে সে দেখে পাতার কামড়
একগাদা শুকনো হলুদ পড়ে আছে দারুণ পিছল
এখানে লেপ্টে শুয়েছিলে

হাওয়ারা জেগে থাকে গাছের ফিসফাস শোনে এইখানে
জুতোর চাপ ক্রমাগত মন খারাপ করে
আবার বৃষ্টি এলো কান্না বারণ ছিলো আবারও হয়েছে এই
থেমে থাকবার ঘুম গুটোনো হচ্ছে ধীরে
বৃষ্টির সাথে বাতাসে উড়ে আসবে কুয়াশা মাঠ
ঘরের ভেতর ঘাসে কম্বল আর তছরূপ আর ন্যাকড়া আর
প্লাস্টিক সিঁটিয়ে আছে দেখে আরো একটা জেলুসিল চুষি
চুষতে থাকি কালারস আর এ্যাকটিভেটেড ডাইমেথিকোন

মননশীল গল্পকার
অতীন্দ্রিয় পাঠকের
গল্পসংকলন
নির্বাচিত গল্প।। তৃতীয় খণ্ড
মহাদিগন্ত।। ৬০ টাকা

রাণা চট্টোপাধ্যায়

কবিতা ভাবনা

কবিতা বস্তুত রসের ব্যাপার। রস সন্ধানীর কাছে তার মূল্য, অন্যের কাছে নয়। কয়েক হাজার বছর ধরে মানুষ জীবন ধারণের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করেছে, বাসস্থান বানিয়েছে, ইন্দ্রিয় সুখের জন্য সন্তান উৎপাদন করেছে, তারপর মরে গেছে। এতো গেল বেশীরভাগ মানুষের ক্ষেত্রে। কিন্তু অল্প মানুষ এসব ক্রিয়াকর্মের পরও আরো কিছু চেয়েছে। কেউ দেবতার দিকে চলে গিয়ে অধ্যাত্ম চিন্তায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে। কেউ রং-বেরং এর পাথর দিয়ে গুহায় ছবি এঁকেছে। কেউ আবিস্কার করেছে আগুনের। আমি তৃপ্ত নই। আমি ওদের মতোন নিশ্চিন্ত জীবন চাই না। আমার ভেতর এক শিল্পী মুখ তুলে বলছে আমায় বার করে আনো।

এসব তো দশ হাজার বছর আগের আমাদের অতিবৃদ্ধ পূর্বপুরুষের কথা। তারপর একদিন মানুষ ছবি এঁকে শান্তি পাচ্ছে না। আরও কিছুর প্রয়োজন। অক্ষর তৈরি করলো। আর অক্ষর আবিস্কার করার সঙ্গে সঙ্গে মনের অজানা দিক্ খুলে গেল। তাল পাতায় কিংবা খেঁজুর পাতায় ছন্দোবদ্ধ পদ লিখে ফেলল। গুহার ছবি তো সবাইকে দেখানো যায় না, দূরের মানুষ জানতেও পারে না, শিল্পী কার ছবি এঁকে রেখেছে গুহার দেওয়ালে। কিন্তু এই ছন্দোবদ্ধ বাক্য তাল পাতায় লিখে বহুদূরে পাঠিয়ে দাও মানুষ পড়ে নেবে কবির মনের কথা। বস্তুত, অক্ষর আবিস্কারের সঙ্গে সঙ্গেই শ্লোক বা পদ্য'র জন্ম। সমস্ত প্রাচীন ভাষার আদি গ্রন্থগুলি সুললিত ছন্দে স্মরণীয় করে রাখার জন্য পদ্যে রচিত। তাই পদ্যের জন্ম পাঁচহাজার বছর আগের ব্যাপার। সংস্কৃতই হোক, ল্যাটিনই হোক, পালি হোক, কিংবা হিব্রু অথবা ব্রাহ্মী লিপিতে, প্রতীক-রহস্য ছাড়া সবই ছন্দোবদ্ধ পদ। যাঁরা লিপি ও ভাষা নিয়ে গবেষণা করেন তাঁরা এসব জানেন। স্মরণীয় করে রাখার জন্য পদ্য'র সৃষ্টি। কিন্তু পদ্য কি কবিতা? কবিতা হচ্ছে রসের ব্যাপার। পাণিণির ব্যাকরণ কিংবা অথর্ব বেদ কি রসের? কাব্যরস যাতে নেই তা কবিতাই নয়। তবে, চিকিৎসা শাস্ত্র কিংবা কৃষিকার্যের খনার বচন সর্বজনীন, সর্বকালীক। কিন্তু কাব্যরস সর্বকালীক হলেও সর্বজনীন নয়। আজো কবিতার রস সকলে উপলব্ধি করতে পারেন না। কতো লোক ধ্রুপদ-ধামার শেখেন, সেতার বা সরোদ বাদন শেখেন রসগ্রাহী ছাড়া অন্যের কাছে তা বোধগম্য নয়, কিন্তু তাদের নিয়ে কোথাও হাসি ঠাট্টা হয়, একথা আজ অবধি কেউ শোনেন নি। অথচ কবিকে নিয়ে চিরকাল হাসি-তামাশার ব্যাপার ঘটে আসছে।

কেউ তো মাথার দিব্যি দেয়নি, কাব্যরসের স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে। বুঝতেই হবে বেদব্যাস কেন লিখেছেন পাঁচহাজার বছর আগে—

দিবং স্পৃশতি ভূমিঞ্চ শব্দঃ পুণ্যস্য কর্মণঃ।
যাবৎ স শব্দো ভবতি তাবৎ পুরুষ উদ্যতে।।

অকীর্তিঃ কীর্ত্যতে লোকে যস্য ভূতস্য কস্যচিৎ।
স পতত্যধমাল্লোকান যাবচ্ছব্দঃ প্রকীর্ত্যতে।।

সুর করে পড়লে অর্থ না জানলেও অদ্ভুত এক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করবে মনের ভেতর। অর্থ জানলে আরও একটু চিন্তা করা যাবে—

পুণ্য যদি তোমার লিখন প্রশংসিত স্বর্গে তুমি
লক্ষ বছর কেটে গেলেও তুমি ধন্য তোমায় নমি।
পাপ যখনি ধরবে তোমায় হবে তোমার নরকবাস।
তোমার কীর্তি রাখবে মনে পাপেই যেন ধর্মনাশ।

কবে কোন বেদব্যাস এই শ্লোক রচনা করে ছিলেন, আজো আমরা এই শ্লোক হতে দর্শনাতীত দর্শন খুঁজে পাচ্ছি। হয়তো যতকাল সৃষ্টি থাকবে কিছু মানুষ এর কাব্য সুষমায় অভিভূত হয়ে থাকবে। কবিতার ভাষা পুরোনো হলেও রস কিন্তু পুরোনো হয় না—"দূরাদয়শ্চনীভস্যতন্বিতমালতালিবনরাজীনীলা"র সৌন্দর্য্যটুকু আজও হৃদয়ঙ্গম করে কে মুগ্ধ হন না?

কিন্তু কবিতা কি? ছন্দোবদ্ধবাক্য গঠন কি কবিতার অপরিহার্য বিষয়? সুন্দরের বর্ণনা? Art for art's sake? কুৎসিত কোনো কিছুর বর্ণনা কি কবিতা হবে না? নরকের বর্ণনা—Inferno?

অনেক সময় দেখা যায় কবিচিত্তের কল্পনা শব্দ-অলংকারে ভূষিত হয়ে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত হলো। পাঠক পড়ে খুশী হলেও ভাবলেন না

'যদি বর্ষা মাঘের শেষ
ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।'
কিংবা 'কুড়ালি কহিল ভিক্ষামাগি ওগো শাল
হাতল নাহিকো দাও একখানি ডাল।'
অথবা 'ছিপখান তিন দাঁড়/তিন জন মাল্লা/
চৌপর দিনভোর/দেয় দূরপাল্লা।'
অথবা 'বাবা যদি রামের মতন পাঠায় আমায় বনে
যেতে আমি পারবো নাকো তুমি ভাবছো মনে?'

কি কবিতা? সুললিত ছন্দে লেখা পদ্যই কি কবিতা? এসব ছন্দোবদ্ধপদ হলেও এগুলির ভেতর গল্প বা কাহিনী আছে। এগুলিকে "আখ্যান কাব্য" বলা হয় কিন্তু খাঁটি কবিতা নয়। কেন নয়, এবার আমরা একটু ভাবি। বাইবেল, কোরান, বেদ-উপনিষদ থেকে শুরু করে 'শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত' অবধি অধিকাংশই গল্প-কথা। রামায়ণ, মহাভারত ও তাই। কিন্তু এইসব গল্পের ভেতর এমন-এমন কিছু পদ বা শ্লোক আছে যার আবেদন চিরন্তন। যেগুলি গল্প বা কাহিনীর সঙ্গে কবি মিশিয়ে দিয়েছেন তাঁর কবিচিত্তের উৎসারিত কল্পনার

রঙ। আমরা সত্য আশ্রয়ী, জীবনী মূলক এই সব পদ্য-কাহিনী'র নির্যাস হিসাবে এগুলি পাই। রাম-সীতা, অযোধ্যা-দশরথ নিয়ে যদি কাহিনী ছাড়া এসব কবিচিত্তের কল্পনা না থাকতো, আমরা এগুলিকে কোরান, বাইবেল এর মতোন পুণ্য ধর্মগ্রন্থ বলতাম, কখনোই মহাকাব্য বলতাম না। ভাবুন তো বাল্মীকি যখন মিথুনরত ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চী'কে নিষ্ঠুর ব্যাধকে তীর মারতে দেখে বলে ওঠেন— 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগম শাশ্বতী সমাঃ।/ যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেক মাধ্বীঃ কামমোহিতম।" তার সঙ্গে রামচন্দ্রের জীবনের সম্পর্ক কি আছে? কিংবা কৃত্তিবাস যখন লেখেন—

'সুনির্ম্মল জল শোভে দিঘি সরোবর।
কমল উৎপল শোভে গুঞ্জরে ভ্রমর।
নানা বর্ণে পক্ষী সব জলে করে কেলি।
কাঁচ-চাল করিয়া ঘাট বাঁধিয়াছে তুলি।
অশোক-কিংশুক আর চাঁপা নাগেশ্বর।
যাতি-যুথী বকুল দেখিতে মনোহর।।'

চিত্রকূট পর্বতের বর্ণনার কি প্রয়োজন ছিল?

ছিল, ছিল, এগুলিই তো কবিচিত্তের কল্পনা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বহুবার—কবিতা ইতিহাস আশ্রয়ী হলেও ইতিহাসকে ছাড়িয়ে অনেক দূর যায়। আমার কথাতে নয় রবীন্দ্রনাথ যেভাবে মৃত্যুর মাত্র চারমাস আগে প্রয়াতা রানী চন্দকে বলেছিলেন তার উদ্ধৃতি দিচ্ছি— "স্বপ্ন মানুষের যেখানে, সেখানে সে কবি; সেখানে সে সাহিত্যিক। সাহিত্য ইতিহাসকে ছাড়িয়ে গেছে।"

তাই রবীন্দ্র কবিতায় আমরা এরকম অজস্র রসোতীর্ণ 'অধরা-মাধুরী'র সন্ধান পাই। কবির কল্পনা আর পাঠকের কল্পনা এক হয়ে যায়। এই রস কখনো মধুর, কখনো করুণ। কখনো বা বিস্ময় বা প্রেমরসে পূর্ণ। কবির সঙ্গে আমরাও সেই মায়ালোকে প্রবেশ করি—

'মুদিত আলোর কমল কলিকাটিরে
রেখেছে সন্ধ্যা আঁধার পুর্ণপটে।
উতরিবে যবে নবপ্রভাতের তীরে
তরুণ কমল আপনি উঠিবে ফুটে।' (কলিকা)

কিংবা 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থের 'আহবান' কবিতাটি যেখানে কবির অনাস্বাদিত ভুবন আমাদের সামনে হাজির।

"কোন জোতির্ময়ী হোথা অমরাবতীর বাতায়নে
রচিতেছে গান
আলোকের বর্ণে বর্ণে নির্নিমেষ উদীপ্ত নয়নে
করিছে আহবান।

তাইতো চাঞ্চল্য জাগে মাটির গভীর অন্ধকারে
রোমাঞ্চিত তৃণে
ধরণী ক্রন্দিয়া উঠে, প্রাণস্পন্দে ছুটে চারিধারে
বিপিনে বিপিনে।।

এগুলি পদ্য নয়, এগুলি যথার্থই কবিতা। আর কবিতা কখনো তৈরি করা যায় না। তৈরি হয়। অনেকে বলে 'কবিতার নির্মাণ'এর কথা। অনুভূতির নির্মাণ হয়? কবিতা মূর্তি বানানো নয়। কবি ভাস্কর নন। পাথর কুঁদে-কুঁদে একটা অনবদ্য মূর্তি তৈরি করা যাবে। আমি অস্বীকার করি এই মনোভাবের। আংশিক সত্য কখনো সম্পূর্ণ সত্য নয়। আমাকে কি বিশ্বাস করতে হবে বেদব্যাস একটি একটি শব্দ বাছাই করে একদিন লিখে ফেলেছিলেন—'অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যম মন্দিরম/ শেষাং স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃ পরম' এর মতোন শ্লোক?

প্রতিদিন যায় প্রানীগণ যমসদনে
চিরজীবী হব আশা ফুটে ওঠে বদনে।
এর চেয়ে কিছু বিস্ময় আছে ভূলোকে?
স্থির হব জানি ক্ষীণ আশা তবু এ-লোকে।

কিংবা বিশ্বাস করতে হবে ১৪ই মে'১৯৪১, যখন কবি প্রায় মৃত্যু পথযাত্রী, তখনো শব্দ বেছে-বেছে কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নিলেন—

"রূপ নারানের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ,
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায়।
সত্য যে কঠিন
কঠিনেরে ভালবাসিলাম।
সে কখনো করে না বঞ্চনা
আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন—
সত্যের দারুণ মূল্যলাভ করিবারে
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।'

আসলে, কিছু মানুষ সবসময় ঘুলিয়ে দেয়। অনিবার্য্য সত্যটুকু জানাতে চায় না। অনেক কবিতা লেখক (কবি নয়) নির্মাণ-টির্মাণ নিয়ে মাথা ঘামান। ভাল কবিতা কোনদিন নির্মাণ করা যায় না। হয়ে যায়। কি করে হয় কবিও জানতে পারেন না—অনেকটা সেই কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'র 'দেহিপদ-পল্লব মুদারম'এর মতোন আকস্মিক এসে যায়। বানিয়ে বনিয়ে পদ্য লেখা যায় কিন্তু কবিতা লেখা যায় না—

'রাম বলেন শুনভাই স্ত্রী বিনা বন্ধু নাই
সংসারেতে যাহার বাসনা।
দেবতা গন্ধর্ব নর পশু পক্ষ বিদ্যাধর
নাগযজ্ঞ আদি যত জনা।।
আপনি দেব ত্রিপুরারি তাহার বনিতা গৌরী
যোগী হৈয়া নাহি ছাড়ে রঙ্গ।
সমূহ যোগের জ্ঞান সমাধি সঘন ধ্যান
গৌরীরে ধরিয়া অর্দ্ধঅঙ্গ।' (কৃত্তিবাস)

এরকম কবিতার বার্তা কি নির্মাণ করা যায়? আমি কোন বিদেশী কবিতার উদ্ধৃতি দেব না। কারণ শত-শত পঙ্‌ক্তি বাংলা কবিতা থেকে খুঁজে দেখানো যায়, এইসব ধ্রুবপদ আনন্দে, দুঃখে, বিষাদে, স্নেহে, প্রত্যয়ে বেজে উঠেছে পাঠকের হৃদয়ে সুষমা হয়ে। উনবিংশ শতাব্দীর পর বাংলা কবিতায় কয়েকজন কবির কিছু কবিতায় আমরা এই সর্বকালীক ব্যঞ্জনার আভাস পাই। জীবনানন্দ দাশ এরকমই একজন প্রধান কবি, রবীন্দ্রনাথের পর। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত অনেকদিন আগে লিখেছিলেন 'শব্দ চয়নের অক্ষমতা কবিচিত্তের প্রথম ও প্রধান অক্ষমতা।' 'জীব শৈবালের দেহ ও আত্মা উভয়েই নিতান্ত দুর্ব্বল বলিয়া যেমন তাহা জীব হইয়াও নির্জ্জীব, তেমনি দুর্বল বাক্য ও রসের সমবায়ে উৎপন্ন কাব্যকে অকাব্যই বলা যায়। অতি নিকৃষ্ট কাব্যই অকাব্য।'

বাংলা কবিতায় হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া ইদানীং অকাব্যের ছড়াছড়ি। কবিতা যখন হয় না তখন 'ক্যামোফ্লেজ' করে তত্ত্বের কচকচানি করা হয়। কখনো ফতোয়া দেয়া হয় 'কবিতার ইতিহাস তার আঙ্গিকের ইতিহাস।' কখনো বলা হয়—'কবিতার নির্মাণ করেন কবি'। কখনো বলা হয় 'উত্তর আধুনিক কবিতা' হলো এইগুলি। আসলে কাব্যরস যখন আর শব্দকে ছেনে-ছেনেও বার করা যাচ্ছে না, তখন অকবিতা'কে জোর করে কবিতা বলে চালিয়ে দেয়ার ঝোঁক তৈরি হয়। বড় বড় তত্ত্ব দিয়ে অন্ধের হস্তি দর্শন করানোর ব্যাপার হয়ে যায়।

গল্প-উপন্যাসে কতো মার প্যাঁচ চলে আজকাল। কতো নতুন ভঙ্গিমা দেখি বিজ্ঞাপিত লেখকদের লেখায়। কিন্তু হাঁটুর ওপর, কাপড় তুলে বনগাঁর বারাকপুরে 'হরিপদ দাদার সঙ্গে কাঁঠাল তলায় বসে ভেড়া কেনার কথাবার্তা বলে, দুপুরে ভাত খাওয়ার আগে ঝড় উঠলে কালোর সঙ্গে আম কুড়োতেও যাওয়া যায়' (২৭মে ১৯৩৩) আর তারপর 'পথের

পাঁচালী' লিখে ফেলার কোন অসুবিধা হয় না এবং যা তার পরবর্তী ৬০/৬৫ বছর ধরে বাঙালির কাছে স্বীকৃত মহৎ উপন্যাস বলে চিহ্নিত হয়ে যায়। আর সেই সময়ের তথাকথিত 'আধুনিক' লেখক যিনি বলেছিলেন— আপনার লেখাতে একটু আধুনিকতা ঢোকাতে হবে, নইলে এ গেঁয়ো লেখা চলবে না। তিনি কোথায় আর বিভূতিভূষণ কোথায়? সুবীন্দ্রনাথ দত্ত দুষ্প্রাপ্য অ্যানটিক নিদর্শন হয়ে যান। প্রেমেন্দ্র মিত্র টিকে যান কিন্তু বুদ্ধদেব বসু বা 'হারানো অর্কিড' এর কবি অমিয় চক্রবর্তী-রা ক্রমশ হারিয়ে যান। যেতে থাকেন। কারণ—'নীল, নীল/সবুজের ছোঁয়া কিনা তা বুঝিনা/হরেকরকম কম বেশী নীল/'এর ব্যঞ্জনা আমাদের স্পর্শ করে 'এলাদি'র সফিস্টিকেশনের থেকে ঢের বেশী। তাই, কেউ বলুক আর নাই বলুক বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা শক্তি চট্টোপাধ্যায় পাঠকের হৃদয়ে জায়গা করে নেন, 'কবিতা নির্মাণ' এর তত্ত্ব না মেনেও। অনেকে পারেন না। ইদানীং পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর, বা আশি দশকে তো শতকরা আশিভাগ কবিতাই, অকবিতা হয়ে গেছে, যে সব লাইন মুখে-মুখে চলে সেগুলি প্রকৃত কবিতা নয়—কবিতায় গল্প। 'মেহের আলি আমি আর কতো বড় হব'থেকে বড়-বড় কাগজগুলিতে 'দীর্ঘ কবিতা' নামক কাহিনীমূলক কাব্যগুলি অবধি। কিন্তু 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই পৃথিবীর রূপ আমি দেখিতে যাই না আর।' যতই লোকের কাছে অনাধুনিক মনে হোক, এগুলিই থাকবে।

একুশ শতক আসছে। নতুন করে পিছন ফিরে দেখার সময় হয়েছে। এই সময়ের অধিকাংশ কবি নিকৃষ্ট কাব্যকে বড় বেশী ভালবেসে ফেলেছে। বিরাট মোহ নিজেদের নিকৃষ্ট কবিতার প্রতি। তাই প্রতিদিন শত-শত দুর্বল কবিতার জন্ম হয়। আগে তবু ছন্দোবদ্ধ বাক্য পড়ে পাঠক ভাবতেন, আহা দারুণ! যেমন 'প্রিয়ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য/ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা/চোখে আর নেই সেই স্বপ্নের নীল মদ্য/ কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া' (ক্ষমা করুন জ্ঞানপীঠ পুরস্কার বিজয়ী আমার শ্রদ্ধেয় সুভাষ দা (মুখোপাধ্যায়)) কিংবা 'রানার চলেছে তাই ঝুম ঝুম ঘণ্টা বাজছে রাতে'র মতোন চমক সৃষ্টি পদ্য পড়ে, ভাবতেন অহো অমৃত! অত্যুৎকৃষ্ট মহৎ পদ্য! কিন্তু পাঠক, এগুলি কবিতাই নয়। এগুলি 'খনার বচনে'র মতোন স্মরনীয় বাক্যবন্ধ!

আসলে, বাংলা কবিতা এইসব মহৎ চালাকীর জন্য প্রকৃত জায়গা থেকে সরে এসেছে। আমি সামান্য পদ্য লিখিয়েও এইসব করি। প্রকৃত কবিতা লিখবার চেষ্টায় আছেন শতকরা তিনজন। এঁরা এখন হারিয়ে যাচ্ছেন জনস্রোতে পরিবর্তনের দাপটে, কিন্তু একদিন এঁরা ঋষির মতোন বলে উঠবেন—

'ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্য বাক্য বলি উঠে খর খড়্গ সম

তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।'

এ প্রতিবাদ কোন প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা নয়, এই সংকল্প অচলায়তন ভাঙার সংকল্প। ভুল ভেঙে একদিন কবি নিজেকে খুঁজে পাবেন—ধ্যান ভেঙে তিনি বলে উঠবেন—

'হে আকাশ, হে সময় গ্রন্থি সনাতন,
আমি জ্ঞান আলো গান মহিলাকে ভালবেসে আজ
সকালের নীলকণ্ঠ পাখি জল সূর্যের মতন'
(একটি কবিতা: জীবনানন্দ দাশ)

কাহিনীমূলক কবিতা কোন কবিতাই নয়। যদি হতো তাহলে ' দেবতার গ্রাস' বা 'পুরাতন ভৃত্য' মহৎ কবিতা বলে চিহ্নিত হতো। লোকে বলতো না—

'আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী।
বলো কোন্ পারে ভিড়িবে তোমার সোনার তরী।
যখন সুধাই ওগো বিদেশিনী
তুমি হাস শুধু, মধুর হাসিনী,
বুঝিতে না পারি কী জানি কী আছে তোমার মনে।'
(নিরুদ্দেশ যাত্রা)

রবীন্দ্রনাথের একটি অসাধারণ কবিতা।

সুবিমল মিশ্রের এক
বিপজ্জনক, বহুমাত্রিক প্রকাশনা
সত্য উৎপাদিত হয়
আণ্ডার গ্রাউণ্ড

অরণ্য সেন

প্রকৃতই সুন্দরের জন্য মহেঞ্জোদাড়োর দিকে

সলিল চক্রবর্তীর জন্ম ১৯৫৩ সালে ২রা জুলাই। কবিতা লিখছেন প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ বছর ধরে। প্রায় পাঁচটি প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে প্রথম বই 'আমার অশৌচ'-১৯৮১ সালে। কবিতা লেখা শুরু ১৯৭১ সালে। ছোট পত্রিকা 'অনুর' সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বহু পত্রপত্রিকায় লিখেছেন, মূলত কবি। এর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলি 'প্রকৃত সুন্দরের জন্য'১৯৮৬, 'একাবলী'-১৯৮৯, 'পর্বতগ্রন্থে তোমার পা'-১৯৯১ এবং শেষ ও সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ 'মহেঞ্জেদাড়োর দিকে'-১৯৯৭। আমার আলোচনার বিষয় এই শেষ বইটি। সলিল চক্রবর্তী মানুষটিকে বেশ ভালরকম চিনি। শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম এবং বন্ধুত্ব, সলিলদার প্রতি আমরা যারা একটু আধটু লেখালিখি করি তাদের প্রত্যেকেরই আছে। কল্লোল যুগের লেখকদের মধ্যে বুদ্ধদেব, সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র—এঁদের সবার মধ্যে থেকেও জীবনানন্দ যেমন আলাদা তেমনই আমাদের মধ্যে সলিল চক্রবর্তীর অবস্থান। বিভিন্ন কবিতা পাঠের আসরে ওনাকে দেখেছি। শব্দের প্রতি অগাধ মমতা, এই বয়সেও প্রকৃতির প্রতি অপার বিস্ময়, দীর্ঘকাল গ্রামে বাস করেও এখনও গ্রামীন জনজীবন আকৃষ্ট করে তাঁকে। তাই এই কাব্যগ্রন্থে লক্ষ্য করি,'মাঠ জুড়ে পুড়ে যাচ্ছে গো-কুল/লাঙ্গল, ঈষৎ লজ্জায় লজ্জায় আধোমুখ/ফিরে যাচ্ছে তারা চাষীর/ঘরের পিছনে – টানটান'। (মহেঞ্জোদাড়োর দিকে)। আমাদের আজকের এই ভোগবাদী, শুধুমাত্রই ভোগবাদী বিজ্ঞানের দুনিয়ায়, কতটুকুই বা আমাদের মাটির টান? কবি যেন তাই বলে চলেন,'ওদের এখন বিক্রি করে দেওয়া হবে/শাঁখসহরের মেলায়/তারপর কেউ পাবে/দা-কুড়ুলের শরীর, কেউ চেয়ার টেবিল/আর কেউ বা চলে যাবে/মাটির অনেক নিচে/মহেঞ্জোদাড়োর দিকে...'। বড় অদ্ভুত এই কবির দর্শন। প্রথম বইটি বাদ দিয়ে বাকি চারটে বই ক্রমানুসারে পড়ার পর বুঝতে পারি চিন্তার স্বচ্ছতা ও ভাষামুক্তির এক সুবিন্যস্ত প্রয়াস 'মহেঞ্জোদাড়োর দিকে' কাব্যগ্রন্থে বড় পাওনা। যেমন আর এক জায়গায়, 'জাগরণ' কবিতায় উনি বলেছেন,'ভালো ভালো পথঘাট নিয়ে আমি কি করবো/যদি না কেউ কথা শোনে।/ হাওয়া নিয়ে কি করবো?/যদি না তা শরীর জুড়ায়—/কী করবো ঐ অট্টালিকা সম্মান জানাবো কিসে/যদি না খুলে তার হৃদয়।' কি অসম্ভব এই চাওয়ার আন্তরিক আর্তি। অর্থাৎ সেই প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকে মাটি এবং ভালবাসার জন্য এক হাহাকার দেখা যায়। কিছুতেই তার কবিতার এই প্রেম ও প্রকৃতির টানকে ছিন্ন করা যায় না। যেমন বহুদিন আগে এই কবিই লিখেছিলেন,'মাটি এখানে মৌন হয়ে পড়ে আছে।' এখানে 'মৌন' শব্দটি যেন কবির অন্তর্গত হয়ে আকাশে তুলেছে মূর্ধা। ভালবাসার জন্য শোক এবং বিষণ্ণতা বেরিয়ে আসে তার নিজস্ব শব্দে,'আমার না থাকায়, তোমার বিসর্জন হ'লে/তোমাকে কবর দিই/আগুন দিই – ওরা কথা শোনে/ কেবল কথা শোনে।' এ যেন নতুনভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে নেওয়া। যেন অনেকটা জীবনানন্দীয় ঢঙে কবি

উল্লেখ করেছেন একটি নিটোল ভালবাসার চেতনাকল্প। যেখানে শুধুমাত্র শব্দের উচ্ছাস নেই, আছে নিহিত এক পূর্ণ শান্তিময় অবগাহন।

১৯৮১-তে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকে আজকের 'মহেঞ্জোদাড়োর দিকে' ভাষার পরিবর্তনটা বেশ চোখে পড়ে। কখনও ভালবাসা বেদনার, কখনও ক্রোধে গ্রামজীবনের জলছবি যা ক্রমশ পরিবর্তনশীল তা যেন শব্দের মাধ্যমে ব্যঞ্জনাময় হয়ে পড়ে কবিতায়। অথচ নগর জীবনের সন্তাপও মূর্ত হয়ে ওঠে। যেমন 'চিহ্নে' কবিতার ,'স্বর্নকাতান শাড়ি পরে তুমি/ জোকার ট্রামে।/ তোমার পাশাপাশি/মারুতি, মিডি, কন্টেসা, লিমুজিন।/ওখানে বিংশিতা, ম্যারিয়েটা,/সুর্মা, বিশোক মরমিতা ।/দশটায় অফিস--/গাড়িগুলো ফেটে যাচ্ছে,/ চৌচির হ'য়ে যাচ্ছে—' শেষ লাইনে এই কবিতার আর্তি যেন শহরকে বিদ্রুপ করে। এই যে গতি এবং তার যুদ্ধ, এ যেন ভাবে এখানে অনাবিল আনন্দ নেই। সারাদিন শুধু অর্থের সন্ধানে ছুটে চলে উচ্চবিত্ত সংকট। অথচ কোথায় যাবে তারা নিজেরাই জানে না। পাতা,গাছ,আকাশ,গো-কুল এইসব শব্দের পাশে মারুতি,কন্টেসা,বিংশিতা,ম্যারিয়েটা ইত্যাদি শব্দগুলি অনাবিলভাবেই স্থান পায়। তবু ভালবাসার কবিতায় স্বচ্ছন্দ্য কবি এখানে যেন কিছুটা ক্লিশে হয়ে যান। কারণ আমরা বুঝি নিয়মিত নগরজীবনে যোগাযোগ রেখেও, চিরাচরিত গ্রাম ও লোকশিল্প-ও প্রকৃতির তুলনায় এই কবিতায় যেন সূত্র ছিঁড়ে যায়। আরো একটি কবিতা, (আমাদের গ্রাম) এখানে বুঝতে পারা যায় পরিবারের মধ্যে থেকেও সম্পূর্ণ নিজস্ব এক নিঃসঙ্গতা তাকে ব্যথিত করে। উৎসব অনুষ্ঠানে শৈশব ফিরে আসে দিদির মধ্যে, বোনের ভালবাসায় অথচ এক নিদারুণ অতৃপ্তি নিয়ে তিনি লিখে চলেন,'দিদি, আমাদের বাড়ি এলে আর নত হই না/ ছোট বোনও এলে, কাছে যাই না/ আসি,ভুবনেশ্বর থেকে ভাই এলে--/কারণ ও তুলসীমঞ্চ সরিয়ে দিয়ে/ মিটার-ঘর বসাবে!' এই যে বস্তুবাদ,সম্পর্কের মধ্যে ভোগবাদী দুনিয়ার টানাপোড়েন, তার গ্রামজীবন --এক বিশাল পরিবার সেখানেও আজ ধ্বংসের বীজ। 'শোকসভা নেই। --ডাহক মরেছে/ফসলের বিষে/ সাভানা ঘাসের জঙ্গলে শিয়ালের/ চৌচির দেহ/শাবলের আওয়াজ মাটির গভীর শরীরে।/ আমাদের গ্রামে আর ল্যাণ্ড স্কেপ নেই/সব খেয়ে নিয়েছে —যন্ত্র, রোবট আর/কম্পিউটার কেন্দ্র,/প্রেস, ও. এন. জি. সি.,/আই. ও. এল.।/সূর্য এখানে পাক খায়/অনেক উঁচু থেকে/ওই...ওই ওখান থেকে/যেখানে কিছু ছেলে ভুলবশত/সবুজ ঘুড়ি ওড়ায়!' পাঠক লক্ষ্য করুন ভুলবশত শব্দটা। এ যেন কবির এক প্রচণ্ড ক্ষোভ, শৈশবের চিৎকার অন্ধকার রাত্রিকে তুলে আনে। কোথায় এখন আমাদের সবুজ ঘুড়ি! এক নিদারুণ যন্ত্রণা থেকে যেন এ কবিতার সৃষ্টি। যেন আমরা আতঙ্কের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছি।

একচল্লিশটা কবিতার মধ্যে থেকে ভাবনার অভিনবত্ব,শব্দ চয়ন, সবাক ছবির মতো কবির অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের থেকে 'মহেঞ্জোদাড়োর দিকে' বইটিকে আলাদাভাবে পরিস্ফুট

করে। কয়েকটি কবিতায় অন্ত্যমিলের দুর্বলতা থাকলেও আজকের সময়ে কবি খুব সচেতন তার পরিবেশে, তার অন্তর্গত ভাবনায়। নগরজীবন যেন সেই সংকটমোচনে ব্যর্থ। তাই চুপচাপ কবিতায় শুনি সেই শব্দের স্রোত,'কলকাতা নামে এক শহর আছে/ যেখানে কেউ নেই/কলকাতা নামে এক শহর আছে/ যেখানে পাঁচতারা হোটেল নেই,/ রেস্তাঁরা নেই,/ভালো পথঘাট নেই, যানবাহন নেই।/কলকাতা নামে এক শহর আছে/ যেখানে মাখন নেই, সুদৃশ্য পোশাক নেই,/ভালো ভালো খাবার নেই।/বিছুটি,বৃশ্চিক,মশা বিরামহীন কথা বলে।/কলকাতা-ধ্বস্ত-গ্যাস-মুখোশ পরে কথা বলে।'

প্রেম, বিচ্ছেদ, পরিবেশ, যান্ত্রিকতা, নগর ও গ্রামজীবন মিলিয়ে 'মহেঞ্জোদাড়োর দিকে' এক সম্পূর্ণ প্রয়াস যা কখনও বাস্তব কখনও কল্পনার সময়সীমাকে চিহ্নিত করে, যাদের আলাদা করা যায় না। সুব্রত চৌধুরীর প্রচ্ছদ, নামকরণের সঙ্গে যথেষ্ট সংগতি রাখে। ছাপা এবং বাঁধানো খুব উন্নত না হলেও ভালো। কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৯২-১৯৯৬।

মহেঞ্জোদাড়োর দিকে • সলিল চক্রবর্তী • পরিবেশক : বুকমার্ক, ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩ • বারো টাকা।

সত্তরের বিশিষ্ট কবি
সলিল চক্রবর্তীর
এক অসামান্য কাব্যগ্রন্থ
মহেঞ্জোদাড়োর দিকে
পরিবেশক: বুকমার্ক

শঙ্করাচার্যের নিদ্রার মধ্যে স্খালিত শক্তি পান করে এক দাসী অনিন্দ্যসুন্দর গর্ভলাভ করেন। শঙ্কর জানতেন না। সেই দাসী একদিন তার মাতৃত্বের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দাবী করে। 'আমি আপনাকে উদরে স্থান দিয়েছি। আমার রক্ত দেহরস ও স্নেহে আপনি বিকশিত হচ্ছেন আমার ভিতরে। আপনি আমার পুত্র।'

শঙ্কর আশ্চর্য হলেন। অপ্রয়োজনীয় মৃত জড় থেকে জেগে উঠেছে জীবন। তাঁর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু শরীর থেকে নিক্ষিপ্ত ঐ শুক্রাণুগুলি আপাত ব্যর্থ হয়েও অস্বাভাবিক, উজ্জ্বল প্রত্যাবর্তনের ধ্যান করত।

শঙ্কর বললেন: কোন্ আমি সত্য? এই আমি যে কথা বলছে না যে ভ্রূণ পূর্ণতা পাচ্ছে আপনার ভিতরে, সে?

দাসীটি উত্তর দিতে পারেননি। উত্তর দিতে পারেনি সেই তমসাবৃত রাত। প্রদীপের আলোয় বেদান্তের সিদ্ধান্তের জটিলতায় ডুবে যাবার বদলে তিনি নিষ্পলক বসে রইলেন। 'আমি সত্য নই, সত্য নয় পৃথিবী, সত্য এক—ব্রহ্ম, আর সবই কল্পনা। কিন্তু কল্পনা কি বিভাজিত হয়? কল্পনা কি সৃষ্টি করতে পারে নিজের প্রতিরূপ?' তাঁর চোখের সামনে প্রদীপটির শান্ত নীল শিখাটিকেই তিনি দেখতে পান। বাইরের অগ্নিকে নয়। 'জড়ও প্রাণ অর্জন করতে চায়। আমি মিথ্যা বলি সবকিছুকে। মিথ্যা কি? যদি সবই সেই পরম দ্যুতি, তাহলে মিথ্যা যা তাও সেই চিরপ্রণম্য, সত্যেরই অংশ।'

বিচলিত আজ শঙ্কর। দাসীটি তৃপ্ত। তার পূর্ণকুটিরে শুয়ে সে আগামী পৃথিবীকে স্তন্যপান করাচ্ছে। সুধাসমুদ্র বন্ধনমুক্ত হতে চাইছে। 'প্রভু শঙ্করাচার্য ঈশ্বর, এসবই তাঁর লীলা। সত্যের অতিক্ষুদ্র অংশও সত্য। আমি যদি সত্য নাও হই আমার মধ্যেকার এই জীবন, এই শিশু সত্য।'

শঙ্করাচার্য সমস্ত রাত নিদ্রাহীন থাকার পর এখন ক্লান্তির বদলে অরূপ আনন্দ অনুভব করেন। সত্যের রহস্যময় অন্তরে আরো কিছুটা প্রবেশ করতে পেরেছেন তিনি।

নিপা: একদিন, অন্যসময়

গল্পগ্রন্থ □ শ্রীধর মুখোপাধ্যায় □ গ্রাফিত্তি

প্রকাশক:
দেবযানী মুখোপাধ্যায়
'জয়া'
২৬২ ডি/১ বাঙ্গুর এ্যাভিনিউ
ব্লক-এ, কলকাতা-৭০০০৫৫

হরফসজ্জা :
গ্রাফিত্তি ডি. টি. পি. উইং
২/এ, টিপু সুলতান রোড
কলকাতা ৭০০ ০২৬